গঙ্গাফড়িং

ছন্নছাড়া

প্রসঙ্গ : গঙ্গাফড়িং

বর্তমান পৃথিবীর আর পাঁচটি কর্মরত মানুষের মতোই আমার সাদামাটা জীবন। সেই জীবনে চলার পথে যে এলোমেলো চিন্তা এসেছে, এটি তারই সংকলন। ছন্নছাড়া নামে লেখা, কারণ কোনো চিন্তারই ছন্দ নেই। যেভাবে তারা মনের দরজায় এসে কড়া নেড়েছে, এই অপটু হাতে তা গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। কোন সময় তা ছোট গল্পের আকার নিয়েছে। আর কোন সময় কবিতা বা ছড়া হয়ে প্রকাশ হয়েছে।

আর এই 'অগোছালো কিছু কথা' এবং 'এলোমেলো সব ভাবনা' একসাথে আপনাদের দরবারে পরিবেশন করার ধৃষ্টতা দেখাতে গিয়ে 'গঙ্গাফড়িং' ব্যতীত অন্য কোনো ভালো শব্দ মাথায় আসেনি। নদী বা পুকুর ধারে গঙ্গাফড়িং যেমন তার নিজের ছন্দে উড়ে বেড়ায়, ঠিক সেই ভাবেই এই লেখাগুলো এই ছোট্টো বইটির পাতা থেকে পাতায় উড়ে বেড়িয়েছে।

গঙ্গাফড়িংয়ের জন্ম বিগত এক বছর ধরে আস্তে আস্তে হয়েছে। অনেকে হাত না বাড়ালে সে বইয়ের আকার কোনোদিনই ধারণ করতে পারত না। তাদের মধ্যে আমার পরিবার অনেকবার শুনতে রাজি হয়ে লেখাগুলোর পালিশ বাড়িয়েছে। বন্ধু মানসের সূত্র ধরে এক ঝাঁক গুণী মানুষের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্পী দেবজ্যোতি দাস, গ্রাফিক ডিজাইনার সুব্রত ভট্টাচার্য। এছাড়া দেশ-বিদেশের কিছু কাছের মানুষ আর আমাদের জাহির যদি ঠেলা না দিত, তাহলে হয়ত কোনোদিনই গঙ্গাফড়িং তার ডানা মেলতে পারত না। এদের সবার কাছে আমি চির ঋণী।

ছন্নছাড়া

পাতায় পাতায়
সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

অগোছালো কিছু কথা

আমাদের অপু.....৫
দেবদাস.....৯
দুর্গা পূজা ২০২১.....১৯
যাচ্ছেতাই.....২৩
কালো আর হলুদ.....৩৪
মহেশের কথা.....৩৬
ফেরিওয়ালা.....৪১
রাজ আর শ্রী.....৪৮
অহরিমান.....৫৮
চেকমেট.....৭৩

এলোমেলো সব ভাবনা

শঙ্খচিল.....৮৫
সিম্বা-ব্রুনো.....৮৬
বেড়াতে যাওয়া.....৮৭
শপিং মল.....৮৮
মায়ের হাসি.....৮৯
দুগ্গা পুজো.....৯০
মাপ.....৯১
সান্তা জেঠুকে চিঠি.....৯২
নতুন পৃথিবী.....৯৩
দাদু-দিদুভাইয়ের কথোপকথন.....৯৪
রাজবেশ.....৯৫

অগোছালো

কিছু কথা

আমাদের অপু

দিল্লির শীতের সকাল। কুয়াশা ঠেলে এয়ারপোর্ট আসা। আগের রাতে গেলেই ভালো হয়, কিন্তু রাতটুকুই তো একান্ত নিজেদের। তাই অপর্ণাকে রাতটুকু দিয়ে, অপূর্ব রায় ভোরের ঘুমের সাথে লড়াই করে এয়ারপোর্টের পথে পাড়ি দেয়। সেই অপূর্ব রায়! ঠিক ধরেছেন, আমাদের নিশ্চিন্তপুরের অপু।

জীবনের শুরুর বছরগুলোতে বিধাতাপুরুষ সযত্নে বহু ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে তাকে ঘষেমেজে নিজের মতো তৈরি করে দিয়েছে—ঠিক যেভাবে লোহা তীক্ষ্ণ তলোয়ারে পরিণত হয় কয়লার আগুন আর কামারের হাতুড়ির গুণে। আজ অপূর্ব রায় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কোম্পানির এক হোমরা চোমরাও বলতে পারেন। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। ভালোবাসে, আবার ভয়ও করে। 'সেল্ফ মেড ম্যান'-এর একেবারে জীবন্ত উদাহরণ। তার জীবনের কথা তাকে বহুবার বহুভাবে বলতে হয়েছে। সবাই তার এই অসাধারণ 'র‍্যাগ্‌স টু রিচেস' গল্প শুনে আপ্লুত হয়ে যায়। মূলমন্ত্র — 'জীবনে ইচ্ছা থাকলে হয় না, ইচ্ছার জোর থাকা চাই'। এই অসাধারণ উন্নতি সাধারণভাবে দেখানোর মধ্যে অপু আনন্দ পায়, একটা চাপা গর্ব অনুভব করে।

শীতকে উপেক্ষা করে বহু যাত্রী এয়ারপোর্টে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। নিজেদের লাগেজ আর ঘুমের ঝুলি নিয়ে মন্থর গতিতে সবাই এয়ারপোর্টের দরজার দিকে

অগ্রসর হচ্ছে। কোনোরকমে টিকিটের সঙ্গে আইডি প্রুফ দেখিয়ে ঢুকে পড়লো অপু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল হলে। বাইরের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডার পর ওই এক মুহূর্ত সে যেন এক অদ্ভূত অনুভূতি। স্বর্গীয় মনে হয়, তারপর অবশ্য তত তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায়। খুব ভালো লাগা অনুভূতিগুলো বোধহয় বেশিরভাগই ক্ষণস্থায়ী হয়। এই নাহলে তার মাধুর্য থাকে না।

ফ্রিকোয়েন্ট ফ্লায়ার যারা হন, তাদের লাগেজগুলো এক্কেবোরে আলাদা। সুন্দর মাপ, না বড়, না ছোটো। হুড়মুড় করে সেগুলি নিয়ে তারা প্লেনে উঠে পড়েন। আবার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সবার আগেই তারা ভীড়কে টেক্কা দিয়ে সময়কে বশ করে আগেই হারিয়ে যান। অপুর আর এই অভ্যাস হয়ে ওঠেনি। চাকরি এবং সংসার ব্যতীত, আর কোনো আলাদা চাপ নেওয়ার সে পক্ষপাতী নয়। তাই লাগেজ চেক-ইন করে, আস্তে আস্তে সিকিউরিটি চেকের দিকে এগিয়ে যায়।

সিকিউরিটি চেক শেষ হতে ঘড়ির কাঁটাটা অনেকটা এগিয়ে যায়। ইলেক্ট্রনিক নোটিশ বোর্ড-এ তখনো দেখায় প্লেন রাইট টাইম। ঠিক তখনি অপর্ণার ফোন। অপু হাসে, ফোন তুলে বলে, 'তুমি তো অন্তর্যামী'।

'ওষুধগুলো মনে করে খেয়ো।' আদর আর অভিযোগ মেশানো গলায় অপর্ণার অনুরোধ। অপুর মধ্যবয়স্ক শরীরের সময় অভিসন্ধি রুখবার অপর্ণার একাগ্র প্রচেষ্টা। এই সেই অপর্ণা। অপুর একান্ত আপন মানুষটি। কোন এক বন্ধুর বোনের বিয়েতে গিয়ে—হঠাৎ তার সাথে দেখা আর দৈবযোগে শুভ পরিণয়। তারপর উত্তর কলকাতার ভ্যাপসা ছোট্ট চিলেকোঠা ঘরে এক্কা দোক্কা খেলে সাজানো সংসার।

বাড়িটা খুব ছোটো থাকায় অভাব থাকলেও, ভালোবাসায় টইটম্বুর থাকতো। একে অপরকে আঁকড়ে ধরতে শিখিয়েছিল। একে অপরের মনে অনায়াসে জায়গা করে নিতে সাহায্য করেছিল। লোকে 'লাভ ম্যারেজ'-এর গুণগান শতাব্দী ধরে করে এসেছে। ওদের জীবনে হয়েছে 'লাভ ইন ম্যারেজ'।

এরপর আর দুজনকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এক একটা করে ছোটো

পদক্ষেপ ধীরে ধীরে বড় পদক্ষেপে পরিণত হলো। দুজনেই একসাথে উচ্চ শিক্ষা, অন্য শহরে, অন্য দেশে চাকরি। সবকিছুই যেন ঠিক একটা নিখুঁত অঙ্কের মত হতে লাগল। কাজল ওদের জীবনে খুব তাড়াতাড়ি আসায় ও ওদের বহু ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল। কাজল এখন উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশে পড়াশুনো করে। ওর কথা শোনে অপু আর অপর্ণা। বাইরের পৃথিবীর পড়াশুনোর আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করে। আনমনা হয়ে কফি কাপে চুমুক দেয় অপু।

হঠাৎ একটা ছোট্টো মেয়ের গলা শুনে চমকে যায় অপু। 'হ্যালো জেঠু, তোমার কাছে একটা পেনসিল হবে?' সামনে একটা দশ-এগারো বছরের মেয়ে। ঘাপসি চুল, বড় বড় দুটো টলটলে চোখ। সুন্দর, শ্যামবর্ণ গায়ের রং। 'তুমি কি করে জানলে আমি বাঙালি?' অপুর প্রশ্নে উত্তর দিলো ছোট্টো মেয়েটি 'দূর! আমি কি জানি! মা বলে দিল যে'। বলে মাকে দেখিয়ে দিল। একজন অল্প বয়সের মহিলা। পুরো নাজেহাল। চার-পাঁচ বছরের ছেলেটি মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

'তোমার ভাই?'

'হ্যাঁ। কিছুতেই কথা শুনছে না। এক্ষুনি ও ড্রইং করতে চায়। মা তো পেনসিল বক্স সব প্যাক করে লাগেজে তুলে দিয়েছে।' কাছে গিয়ে জানা গেল ভদ্রমহিলা সিকিউরিটি লাইনে অপুকে বাংলাতে কথা বলতে শুনেছিলেন। আর এয়ারপোর্টে এই দামাল ছেলেকে বাগে আনার অন্য কোনো উপায় মাথায় না আসায় এই নিরুপায় অনুরোধ। ব্যাগ খুঁজে পেনসিল পাওয়া গেল না, কিন্তু পাওয়া গেল একটা দুটো লাল-নীল পেন। মেয়েটি লক্ষ টাকার লটারির টিকিট পাওয়ার মত আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাইয়ের কাছে সেগুলি নিয়ে গেল।

দিদির এই আলাদীনের জিনের মতো আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে ভাই আহ্লাদে আটখানা। মন দিয়ে পেনগুলোর সদ্ব্যবহার করতে শুরু করে, মা পেলেন স্বস্তি আর অপু পেল ওদের সাথে কথা বলার সুযোগ। ভদ্রমহিলার সাথে কিছু কথা এগোনোর আগেই ওনার ক্লান্তিতে উনি হোঁচট খেলেন। মেয়েকে বললেন, 'মিনু মা, ভাইকে দেখিস একটু, আমি চট করে একটু ঘুমিয়ে নি।'

অপুর খুব কৌতূহল হল। এক রত্তি মেয়ে, সে নেবে ওই দস্যি ভাইয়ের দায়িত্ব। জিজ্ঞেস করলো 'তোমার নাম কি মিনু?'

'আমার নাম মৃণ্ময়ী। মিনু বলে বাপি আর মা ডাকে। তুমি কিন্তু পুরো নাম ধরেই ডেকো।' এলো মিনুর উত্তর।

অপু ভারী মজা পেলো। 'তোমার ঘুম পায়নি?'

পেয়েছে তো। কিন্তু ভাইকে কে দেখবে?'

এই উত্তর অপুর শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। হঠাৎ ওর নিশ্চিন্তপুরের বাড়ি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মা সর্বজয়া এমনি করেই সব কাজের শেষে ঘুমিয়ে পড়তো। আর তার দুর্গাদিদি ছায়ার মতো তাকে আগলে রাখতো। কালবৈশাখীর ঝড়ের সময় মুখুজ্জেদের বাগানে আম চুরি করতে যাওয়া। সারা দিনে বন-বাদাড়ের আনাচে কানাচে ঘুরে তার জন্যে পাকা নোনা বা মাকাল ফল নিয়ে আসা। এর জন্যে মায়ের কাছে দিদিকে কত না উত্তম মধ্যম খেতে হয়েছে। ইছামতী নদীর ধার ধরে ছোটো ছোটো মাছ ধরা। আধকাঁচা আলু বেগুন রান্না করে চড়ুইভাতি করা। তার শৈশবের প্রতিটি মুহূর্তে দিদির হাতের পরম স্নেহের চাওয়া আবার সে অনুভব করলো। সর্বজয়া তার জন্মদাত্রী, কিন্তু দুগ্গা দিদির হাত ধরেই তার এই পৃথিবীতে অভিষেক।

অপুর হঠাৎ মনে হলো, হয়তো নিশ্চিন্তপুরে ফিরে গেলে, আবার তাদের জীর্ণ বাড়িতে দিদিকে সে খুঁজে পাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে কখন সে প্লেনের সিটে এসে বসেছে তার মনে নেই। বিধাতাকে বার বার অভিশাপ দিতে ছাড়লো না। 'তুমি যেমন এক হাতে দিয়েছো, অন্য হাতে কেড়ে নিয়েছো আমার শৈশব, আমার দিদি, আমার দেশ, আমার মাটি। যে পথের আনন্দ যাত্রার অদৃশ্য তিলক আমার কপালে পরিয়ে দিয়েছো তার সাথে কেন লেপে দিয়েছো এত দুঃখ?'

চারিদিক ঝাপসা হয়ে গেছে। দু-চোখ ভর্তি জল, গলায় জমাট কান্নাটা ডুকরে বেরোনোর আগেই প্লেন গর্জে আকাশে ডানা মেলে দিল। ❑

দেবদাস

ঘড়িতে কটা বাজে জানা নেই। হঠাৎ ঘুম ভাঙে দেবদাস মুখার্জির। ঘরটা বেশ অন্ধকার। একটা নম্র সাদা আলো জ্বলছে। বীপ বীপ করে মেশিনের আওয়াজ। কিছুক্ষণ পরে দেবদাস বুঝতে পারলো এটা একটা হাসপাতালের ঘর। তার ডান হাতটা বিছানায় বাঁধা, খুব মোটা টিউবের তার ধমনীর মধ্যে প্রাণরসের সঞ্চার করছে। ডান হাতে কোনো সাড় নেই। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। মনের যন্ত্রণা যেন কম ছিল এখন শরীরও একই সুরে গলা মেলালো। আবার সেই পরিচিত বিরক্তি আঁকড়ে ধরলো দেবদাসকে।

একটু একটু করে সব স্মৃতি ফিরে আসতে লাগলো। পারোর (পার্বতী) সাথে দেখা করতে এসেছিল ব্যাঙ্গালোরে। পার্বতী বিয়ের পর ওখানেই থাকতো। তার স্বামী ভুবন চৌধুরী, ব্যাঙ্গালোরে ল' স্কুলের নামকরা শিক্ষক।

বিবাহের অল্প কিছুকাল অতিবাহিত হবার আগেই এক অজানা রোগে প্রথম স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর অকাল প্রয়াণ হয়। ভুবনবাবু বিপত্নীক হওয়ার পর বিয়ে করবেন না ঠিকই করেছিলেন। কিন্তু তার মা নলিনী দেবী এক্কেবারে নাছোড়বান্দা। 'বাবা তুমি একা হয়ে গেছো। একাকীত্ব আর মৃত্যু, এর মধ্যে বেশি পার্থক্য নেই।' বহু চেষ্টা করেও জেদ বজায় রাখতে না পেরে অবশেষে তিনি রাজি হয়েছিলেন। সেও প্রায় বছর পাঁচ আগের কথা।

গত পাঁচ বছর পার্বতী দেবদাসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি। ফোন করলে ফোন তোলেনি। ই-মেলের জবাবও দেয়নি। এমন কি সোশ্যাল মিডিয়াতেও পার্বতীর কোনো সাড়াশব্দ দেবদাস পায়নি। রাগে, দুঃখে অভিমানের আগুনে দেবদাস এই পাঁচ বছর ধিক ধিক করে জ্বলেছে, সে কথা কে না জানে!!

যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে তুলনামূলক সাহিত্য বা কমপ্যারেটিভ লিটারেচার নিয়ে দেবদাস আর পার্বতী দুজনেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। তারপর দুজনেই ছুট দেয় দিল্লিতে জেএনইউ (জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি)-তে ইংলিশে মাস্টার্স করবে বলে। মাস্টার্স করাটা একটা অজুহাত ছিল। একে অপরকে নতুনভাবে পাওয়া, এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। দুজনেই সংরক্ষণশীল পরিবারের সদস্য হওয়াতে ওদের মেলামেশা কেউ ভালো চোখে দেখতেন না। পার্বতীর বাবা নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী এই ব্যাপারে বহুবার মেয়ের কাছে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। নীলকণ্ঠবাবু পূর্ব কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ। পরিবারে সবাই চাকুরিজীবী ছিলেন। অন্যদিকে দেবদাসদের ছিল বিত্তশালী ব্যবসায়ী পরিবার। ব্যবসা ছিল মশলাপাতির। ওরা কলকাতার রান্নার মশলাপাতি সরবরাহ করতেন। দেবদাসের বাবা নারায়ণ মুখার্জিকে সবাই কলকাতার 'স্পাইস কিং' নামে চিনতেন। দেবদাসের পরিবারের বহু সদস্য প্রায়ই কাগজের পেজ থ্রি-তে ধরা পড়তেন। 'ব্যবসায়ী বাড়িতে মেয়ে সুখী হবে না। তেল আর জল কক্ষনো মেশে না গিন্নি এটা মনে রেখো।' নীলকণ্ঠবাবুর স্ত্রী প্রতিমা দেবীকে এই কথা প্রায়ই শুনতে হতো।

পার্বতী-দেবদাসকে দেখে অবশ্য কেউ বলবে না ওরা এইসবের তোয়াক্কা করতো। ওদের হয়েছিল 'প্রথম দর্শনেই প্রীতি'। ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে দেখা, তারপর আর কোনো বাঁধনই ওদের ধরে রাখতে পারেনি। পুরো ইউনিভার্সিটি ক্যামপাস দেব-পারোর ভালোবাসার রঙে ছেয়ে গিয়েছিল। পড়াশুনোতে দুজনেই মেধাবী ছাত্র তো ছিলই, তা ছাড়াও দেবদাস খুব ভালো ছবি তুলতে পারতো। আর পার্বতী ছিল কৃতি ভারতনাট্যম শিল্পী। ইউনিভার্সিটির ফেস্ট-এ, সারা ক্যাম্পাস নিজের হাতে তোলা পার্বতীর নাচের বিভিন্ন মুদ্রা ও

মুহূর্তের আলোকচিত্র দিয়ে সে ভরিয়ে দিয়েছিল। পার্বতী স্বভাবে চাপা, দেবদাস সব কিছু অতিরঞ্জিত করতে ভালোবাসতো। অর্থবান ঘরের ছেলেরা বোধহয় ওইরকমই হয়। সাধারণকে সাধারণভাবে দেখার মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য তারা খুঁজে পায় না। ওদের দুজনের ভালোবাসাও যে অসাধারণ কিছু, তা সবসময় নানাভাবে সে প্রমাণ করতে চাইতো। এই উগ্রতা পার্বতীর খারাপ লাগতো না। বয়সটাই হয়তো তাই। আর প্রথম প্রেম, সবই ভালো লাগে।

যাদবপুরের তিন-তিনটে বছর বসন্তের উতলা উচ্ছল হাওয়ার মতো কোথা দিয়ে চলে গেলো দুজনেই টের পেলো না। জেএনইউ তার মতো করে ওদের আপন করে নিলো। বিবিধের মাঝে দেখো মিলনমহান। ওদের জীবনে এলো কিছু নতুন বন্ধু। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চুনীলাল আর চন্দ্রমুখী মিশ্র। ওরা দুজনেই বিহারের বাসিন্দা। চুনিলাল খুব ভালো আধুনিক গান গাইতো। আর চন্দ্রমুখী ছিল ম্যারাথন রানার। বিহারের অ্যাথলেটদের মধ্যে ওর ছিল সবচাইতে কম সময়ে ম্যারাথন শেষ করার রেকর্ড। জেএনইউ-তে পদার্পণও স্পোর্টস কোটাতেই। পড়াশুনো করাটা ডিগ্রি পাওয়া ছাড়া আর অন্যভাবে ও দেখেনি। ওর সুপ্ত বাসনা ছিল ভারতে এশিয়াডের মেডেল এনে দেওয়া। তাতে সে পাবে সম্মান, যশ আর একটা কোনো সরকারী সংস্থাতে চাকরি। এটাই ছিল তার দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্ন।

স্বপ্ন বড় কিংবা ছোটো এটা খুবই আপেক্ষিক। চন্দ্রমুখীর বাবা পাটনা পোস্ট অফিসে একজন অতি সাধারণ কর্মচারী। আর সেই ছিল একমাত্র সন্তান। তাই এই স্বপ্নকেই সাকার করতে তাকে তার পরিবার অনেক অর্থাভাব থাকা সত্ত্বেও দিল্লিতে পাঠায়।

চন্দ্রমুখী অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। তার মধ্যেও ছিল একটি খুব মজার শখ। সে রেডিওতে গান শুনতে ভীষণ ভালোবাসতো। বাড়িতে অভাব থাকায়, আমোদ প্রমোদের খুব সহজ উপাদান হিসেবে ওদের পরিবারের সবাই রেডিও শুনতেন। সেই অভ্যেস ও দিল্লিতেও বহন করে এনেছিল। দিল্লিতে এসে এই দেব-পার্বতীর পাল্লায় পড়ে, বাংলা গানও শুনতে শিখল।

বাকি তিনজনের ছিল না কোনো ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তাদের আর্থিক অবস্থা অনুকূল হওয়াতে 'কালের চিন্তা' কোনো কালেই তাদের মনে প্রাধান্য পায়নি। চুনীলালদের ছিল অনেক জমি। বিহারে ওদের জমিদারিও বলা যেতে পারে। পুরো পরিবারে সেই প্রথম উচ্চশিক্ষা লাভ করতে বিহারের মাটির বাইরে পা রাখে। ছেলের এই শখ মেটাতে লালবাবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়ে যান।

এদিকে জেএনইউ-তে ওদের চার জনের বোঝাপড়া যত বাড়তে লাগলো, তত তাড়াতাড়ি কাটতে লাগলো দিনগুলি। হঠাৎ ওরা দেখলো ওদের জেএনইউ-এর দিন প্রায় শেষ। আর কয়েকটা পরীক্ষা বাকি। তারপর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

মূল গল্পে ফেরা যাক। এদিকে লৌকিকতার খাতিরে দেবদাস আর পার্বতীর পরিবার একবার দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল। ফল যা ভাবা গিয়েছিল তাই হলো। ওদের কারুরই একে অপরকে ভালো লাগেনি। উভয়ের ব্যবহারে আর কথাবার্তাতে পদে পদে সেটা প্রকাশ পেলো। দুটি পরিবার সিদ্ধান্ত নিল তারা ছেলেমেয়েদের এই উচ্চাশায় রাশ টানবে।

জেএনইউ-র পরীক্ষা সবে শেষ। হীরামতি দেবী, দেবদাসের মা, ছেলেকে ফোন করে খবরটা দিয়ে দিল। দেবদাস কথাটার মানে খুব ভালো বুঝলো বলে মনে হলো না। জীবনে কোন ব্যাপারে সে 'না' শব্দ শোনেনি। তাই জীবনের তার সবচেয়ে আকাঙ্খিত মানুষটিকে সে কোনোদিন পাশে পাবে না, এই কথাটার বোধগম্য না হওয়াই স্বাভাবিক। চারজন আলোচনা করে স্থির করলো কলকাতা যাবে এবং ওরা দুই পরিবারকে বুঝিয়ে বলবে।

ঘটনাটা সংক্ষেপে বলি। কলকাতাতে যে আত্মবিশ্বাসের সাথে আসা হয়েছিল তিনচার দিনের মধ্যে কর্পূরের মতো তা উবে গেলো। দুই পরিবার তাদের সিদ্ধান্তে অনড়। তাদের বক্তব্য যদি দেব-পার্বতী তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগোয়, কোন পরিবারই তাদের সাথে কোনোরকম সম্পর্ক রাখবে না। দেবদাস জীবনে নিজের খেয়ালের রাজত্বে বাস করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। জীবনে দায়িত্ব নেওয়া, সংগ্রাম করা কি, তা তার কাছে সম্পূর্ণ অজানা।

পার্বতী তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আমি রাজি, তুমি আর আমি বেরিয়ে গিয়ে

কিছু একটা করে নেবো। কি পারবে না?' ভয় পেলো দেবদাস। 'আমাকে একটু ভাববার সময় দাও পারো।' বাইরের কঠিন পৃথিবীর সম্মুখীন হওয়ার কথা ভেবে তার পা টলে গেলো। পার্বতী নাছোড়বান্দা, 'কতো সময়'। চুনীলাল আর একটা বুদ্ধি দিলো। দিল্লিতে ফিরে যেতে। সেখানে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দেবদাস জীবনে কোনা প্রতিকূলতা দেখেনি। সে আর ভাবতেই পারলো না। সে বললো, সে কোনো কথাই দিতে পারবে না। তার হয়তো অনেক সময় লাগবে। পার্বতী আর দেবদাসের সেই শেষ দেখা।

এর মধ্যে একটাই ভালো খবর ছিল। চন্দ্রমুখীর দিল্লিতে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়াতে পাকা চাকরি হয়ে গেলো। তাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হলো চাকরিতে যোগ দিতে।

এই কিছুদিনেই ওরা তিনজন—চুনীলাল, পার্বতী, দেবদাস হঠাৎ অনেকটা বড় হয়ে গেলো। জীবনের রূঢ় বাস্তব ওদের চাবুক মেরে জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা দিলো, ভালোবাসা এক, ভালো-বাসা তৈরি করা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। সেটার জন্যে আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন।

পার্বতী বাড়ি ফিরে এলো। কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর মা-বাবাকে বললো সে বিয়ে করতে প্রস্তুত। কিন্তু একটি শর্ত আছে। যাকেই সে বিয়ে করবে, তাকে সে তার আর দেবদাসের পুরো ঘটনাটা বলবে এবং তারপর উভয়পক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে। নীলকণ্ঠবাবু আর প্রতিমা দেবীর ঘটনাটা ভালো না লাগলেও, মেয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন না। অনেক পাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করলো। এর মধ্যে ছিল ভুবনবাবুর মা নলিনী দেবীর চিঠি। পরিস্কার অথচ স্বল্প শব্দে তিনিও আর্জি জানিয়েছেন। পার্বতীর কৌতূহল হলো। সে বাবা-মাকে ভুবনবাবুর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করতে বললো। নিরুপায় বাবা-মা সন্তানদের বুকেপিঠে করে মানুষ করা ছাড়াও প্রতি মুহূর্তে আরও কতো কঠিন পরীক্ষা দিয়ে যেতে থাকেন, সেটা আর নাই-বা বললাম। পাত্র এবং পার্বতীর মধ্যে প্রায় দশ পনেরো বছরের তফাৎ। অনেক কষ্টে মেয়ে রাজি হয়েছে, তাই মেয়ের এই আদেশ, না করা কার সাধ্যি।

ভুবনবাবু আর পার্বতীর দেখা হল। পার্বতী কিছু কথা বলার আগেই, নিজের পুরো কাহিনী ওনাকে বলল। ভুবনবাবু খুব মন দিয়ে শুনলেন। একটাও প্রশ্ন করলেন না। সব শুনে বললেন, 'আমি নিজে সংসার করেছি। জীবনে সবচেয়ে কাছের মানুষটিকে হারিয়েছি। আপনি হয়তো সেই অর্থে সংসার করেননি, কিন্তু আপনিও আপনার পরম আকাঙ্ক্ষিত মানুষটিকেও ছেড়ে এসেছেন। আমাদের বয়সের দেওয়াল যদি উভয়ের মধ্যে খুব উঁচু না হয়ে থাকে, আমাদের এই দুঃখ আমাদের আগামী জীবনে একে অপরকে ঠিক করে চলতে সাহায্য করবে। আর যদি আমাদের কথা এগোয়, আমার একান্ত ইচ্ছে আপনি ব্যাঙ্গালোরে আপনার একটা পৃথিবী তৈরি করে নেবেন। সে চাকরি হোক, আপনার নাচ কেন্দ্রিক কোন ব্যাপার হোক, একটা কিছু। যেটা হবে একান্ত আপনার। এটাও আপনাকে জীবন যুদ্ধে আরো আত্মবিশ্বাস এনে দেবে।' পার্বতী আর কোন প্রশ্ন করেনি। এরপর আর কোনো প্রশ্ন থাকে না। পরের এক সপ্তাহের মধ্যে একটি ছোটো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পার্বতী আর ভুবন চৌধুরীর বিয়ে হয়ে যায়। পার্বতী উড়ে যায় তার নতুন সংসার করতে। সেই চার-পাঁচ বছর আগের কথা।

পার্বতীর বিয়ের খবর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছিল মুখার্জিদের পরিবারে। চুনীলাল আর কয়েক মাস দেবদাসের বাড়িতে থেকে যাওয়াতে, দেবদাসের মা-বাবা কিছুটা ভরসা পায়। ওরা তিনজন এই পরামর্শ করেন যে দেবদাস যদি দিল্লিতে গিয়ে কোন একটা কাজে মন দেয়, তাহলে হয়তো কিছুটা অবস্থার উন্নতি হতে পারে। দেবদাসের মানসিক অবস্থাটা না বলাই ভালো। সেই পার্বতীর মতো চুপচাপ হয়ে যায়। বাবা-মায়ের আদেশ সে অমান্য করে না। বরঞ্চ সানন্দে মেনে নেয়। আর তার এখানে থাকতে ভালো লাগছিল না। কোনোদিন সে জীবনের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি, সমাধান তো দূরের কথা। সে শুধু পালাতেই শিখেছে। তাই তার এই ব্যবহার অযাচিত নয়।

দিল্লিতে ফিরে চুনীলাল আর দেবদাস গিয়ে উঠলো চন্দ্রমুখীর কোয়ার্টারে। খুবই ছোট্ট কোয়ার্টার। শুরুর আগেই শেষ হয়ে যায়। সেখানে চন্দ্রমুখী আর

চুনীলাল মিলে দেবদাসের একটা ফাইল তৈরি করে। ওর কিছু ছবি, কিছু লেখা সব মিলে একটা মানানসই পোর্টফোলিও তৈরি হয়। তারপর মাসখানেক চেষ্টা, একটা চাকরি হয়ে যায় চুনীলাল আর দেবদাস দুজনেরই।

দিল্লির একটা নামকরা অ্যাড এজেন্সিতে চাকরি। দেবদাস হলো ফটোগ্রাফার, চুনীলাল গাইতো সেখানে জিঙ্গল। যা রোজগার হতো, যেহেতু দুজনেই রাজপুত্র, কোনো সঞ্চয়ের বালাই ছিল না। আমোদ আহ্লাদেই খরচা হয়ে যেত। ওদের জীবনের একমাত্র বাঁধন ছিল সেই চন্দ্রমুখী। বেশির ভাগ সন্ধ্যাবেলা ওর বাড়িতেই বসতো আড্ডা। দেবদাসের দুর্বলতা ছিল মদ্যপান করা। চুনীলালের হাত ধরে সে মদ খেতে শিখেছিল ঠিকই। প্রথমে সে মদ খেত। তবে কিছু সময় যেতে না যেতেই মদ তাকে খেতে শুরু করলো। পার্বতীকে না পাওয়ার দুঃখ তার কাছে ছিল জীবনের প্রথম আর সবচেয়ে নির্মম পরাজয়। বিধাতাকে সে বার বার ধিক্কার দিতো, কেনো তাকে সেই চরম মুহূর্তে পার্বতীর হাত ধরার সাহস না জোগানোর জন্যে।

মানুষ যখন তার নিজের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়, তখন প্রথমেই সে দেবতাকে দোষ দেয়। দুর্বল দেবদাসের থেকে এর বেশি আশা করাও কঠিন। চুনীলাল প্রথম কিছু বছর তার এই দুঃখের ভার বহন করেছিল, কিন্তু সেও এরপর বিরক্ত হয়ে গেলো। চন্দ্রমুখীর বাড়িতে আসা সে বন্ধ করে দিলো।

পড়ে রইল দেবদাস আর চন্দ্রমুখী। চন্দ্রমুখী বিরক্ত হতো ঠিকই, কিন্তু পুরো ঘটনার সাক্ষী থাকার জন্যেই সে দেবদাসকে ত্যাগ করতে পারতো না। এর জন্যে তার নিজের আত্মীয় পরিজনদের কাছেও অপমানিত হতে হতো। কোনোভাবে লজ্জা, সংশয়ের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কেটে যেতে লাগলো।

গত চার বছরে দেবদাস কোনোরকমে চাকরিটাতে টিঁকে গেল। ওর হাতের কাজ আরো ভালো হওয়াতে বিজ্ঞাপন এজেন্সি ওকে রেখে দেয়। একদিন দেবদাসের খেয়াল হলো সে পার্বতীর সাথে দেখা করতে চায়। চন্দ্রমুখী শত চেষ্টা করেও তাকে বাধা দিতে পারলো না। অফিসে ছুটি নিয়ে জেদ করে সে হাজির হল ব্যাঙ্গালোর ল' স্কুলের ক্যাম্পাসে। সঙ্গে তার ছায়া চন্দ্রমুখী। তারই

ওপর ভার পড়লো পার্বতীর সাথে দেখা করবার ব্যবস্থা করার। এর বিনিময়ে দেবদাস কথা দিলো যে পার্বতীর সাথে একবার বোঝাপড়া হয়ে গেলে, সে তার স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে ফিরে যাবে।

পার্বতী চৌধুরীর সাথে দেখা করার সময় ঠিক হলো রবিবার বিকেল। শনিবার সকাল থেকেই দেবদাসের শরীরের অস্থিরতা বেড়ে যাওয়াতে, তাকে ডাক্তার দেখানো হয়। এবং ডাক্তারই পরামর্শ দেন চন্দ্রমুখীকে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্যে। দেবদাস এতে এতো রেগে যায়, যে চিৎকার করে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। তার আর কিছু মনে নেই।

ওই আধো অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে থাকতে, কিছুক্ষণ পরে একটি নার্স এল। তার কাছ থেকে দেবদাস জানতে পারে, প্রায় একদিন হল ওখানে ভর্তি আছে। আর বেশি কিছু নার্সদের বলা বারণ। ওর টেম্পারেচার, প্রেশার চেক করে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পরে বোধহয় হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হল। সিঙ্গল রুমে থাকায় তার ঘরে কেউ এল না। বাইরে অনেক লোকের কথাবার্তা শুনতে পেলো সে। তারপর হঠাৎ পর্দা সরিয়ে স্বর্গের দেবীর মতো পার্বতীর প্রবেশ। দেবদাস কথা হারিয়ে ফেললো। পার্বতী খুব সুন্দরী ছিল কিন্তু এখন তার সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

কাছে এসে একটা চেয়ার টেনে বসলো। 'তাহলে তোমার ঘুম ভাঙলো? বলো কি বোঝাপড়া করবে?' একটু কৌতুক করেই দেবদাসের সাথে কথা শুরু করলো। ভুবনবাবুও ঘরে ঢোকায়, দেবদাস একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। 'মিঃ মুখার্জি, আপনাকে এইখানে এইভাবে স্বাগত জানাবো আমাদের শহরে ভাবতেই পারিনি। কোথায় বাড়িতে এসে ভালো খাওয়া দাওয়া করে গল্প করবেন। নিন তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে উঠুন।' বলে পার্বতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি চললাম, গাড়িটা আমি পৌঁছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে উনি বিদায় নিলেন।

'আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলে এসেছি। তোমার এই অবস্থা অত্যন্ত

অনিয়ম থেকে হয়েছে। তুমি ঠিক আছো। কালই তোমাকে এরা ছেড়ে দেবে বলেছে।' এই কথা বলে পার্বতী দেবদাসকে আশ্বস্ত করলো। দেবদাসের সব ভাষা কোথায় হারিয়ে গেলো কে জানে। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো পার্বতীর কথা শুনতে লাগলো।

গত চার-পাঁচ বছরে ভুবনবাবুর সাথে সে নতুনভাবে বাঁচতে শিখেছে। এখানে একটি নামকরা স্কুলে সে শিক্ষিকা। ভগবানের করুণাতে তাদের যমজ কন্যা সন্তান হয়েছে। তাদের নাম রাখা হয়েছে দেবশী আর দেবাত্রি। 'তোমাকে আমি ভুলিনি দেব, মেয়েদের নামের মধ্যে তোমার নাম মিশিয়ে রেখেছি। তুমি আমায় পৃথিবীটাকে চিনতে শিখিয়েছিলে। সে অবদান আমি কোন ভুলবো না। ভুবন শিখিয়েছে কি করে সেই পৃথিবীতে ভালো করে বাঁচা যায়। আর অন্যের চোখ দিয়েও পৃথিবীটা অনুভব করা যায়।'

'এই ক'বছরে তুমি জানো না আমি তোমার সব খবর রেখেছি। চন্দ্রমুখী আর আমি সবসময় তোমার কথা আলোচনা করেছি। আর এই কথা আজ তোমাকে আমি বলতে পারি, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি ঠিকই, কিন্তু চন্দ্রমুখীও তোমাকে কম ভালো বাসেনি। জেএনইউ-তে সে আমাদের সম্পর্ককে সম্মান করতো। তারপর যখন থেকে তুমি দিল্লিতে আবার ফিরে গেছো, সে তোমাকে যক্ষের ধনের মত আগলে রেখেছে। নিজের পরিবারের কত কটু কথা শুনেও তোমাকে সে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সে হয়তো তোমার আমার মত পাঁচটা বই পড়েনি, তার ভালোবাসা ব্যক্ত করার জন্যে, কিন্তু তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে তোমার সাথে ছায়ার মত থেকেছে।'

'কিন্তু তুমি আমাদের ভালোবাসা আলেয়ার মতো তাড়া করে গেছো। এটা জেনেও যে এর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আর এই গত কয়েক বছর চন্দ্রমুখী তোমার পাশে থেকে একটার পর একটা কঠিন পরীক্ষা দিয়ে গেছে। একবারের জন্যও তোমাকে সে নিজের মনের কথা বলেনি। সে আমাকেও বলেনি। সে হয়তো নিজেও জানে না। শুধু তার ভাবে আমি প্রমাণ পেয়েছি। তোমার সাথে আমার দেখা করার ব্যাপারে, সে আমাকে শপথ করিয়ে নিয়েছে এমন কিছু যেন

না হয় যাতে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যায়। ওকে আজ সকালে চলে যেতে হয়েছে কারণ ওর একদিনের ছুটি মঞ্জুর হয়েছিল।'

'এই স্বার্থপরের পৃথিবীতে এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পাওয়া তাও দু-দুবার, তুমি না জানি কত পুণ্য করেছিলে গত জন্মে।' বলে সে হেসে ফেলল। দেবদাস কিছু বলতে গিয়ে নিজের আওয়াজ খুঁজে পেলো না। পার্বতী বলতে লাগলো, 'তুমি তো এতো বড় সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে। এতো বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করবে? তারপর কাকে দোষ দেবে তুমি? তুমি কি করবে আমি জানি না। তবে এই প্লেনের টিকিট রেখে গেলাম। কালকে বিকেলে তোমার ডিসচার্জ হয়ে যাবে। আমার ড্রাইভার তোমাকে সোজা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে। দিল্লিতে তুমি রাত ন'টার আগেই পৌঁছে যাবে। তারপর তুমিই ঠিক কর কি করবে? এই বলে কাছে এসে দেবদাসের মাথায় হাত রেখে চুলগুলো বিলি কেটে দিল। দেবদাস আর কোনো কথা বলতে পারেনি। তার চোখের জলই সব জবাব দিয়ে দিলো। পার্বতীর চোখ দুটো ছল ছল করছিল। 'ভালো থেকো', বলে পার্বতী বিদায় নিল।

প্লেন ঠিক সময়েই দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামল। একটা ট্যাক্সি দেবদাসকে চন্দ্রমুখীর কোয়ার্টার পৌঁছে দিলো। আজকে কেন জানি কোন সংশয়ে তার পা আর চলছিল না। চন্দ্রমুখীর ফ্ল্যাটের দরজাটা হালকা করে খোলা। রান্নাঘরে ওর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। দরজাটা ঠেলে দেবদাস ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে পা রাখতেই রেডিওতে কিশোর কুমার গমগম করে গেয়ে উঠল 'ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, আমি এসেছি নূতন বেশে, আমি অতিথি তোমারও দ্বারে, ওগো বিদেশিনী...' ❑

দুর্গা পূজা ২০২১

‘সবে তো ফেব্রুয়ারি, এখনই পুজো। আরে, বছরটা একটু গড়াতে দাও। করোনার আতঙ্ক থেকে দেশ ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। আর তোমরা এখনই পুজো পুজো করে পাগল করে দিচ্ছ।’

কে কার কথা শোনে। ২০২০ পুজো এক্কেবারে এত সাধারণভাবে হয়েছে যে সবাই হাসফাঁস করছে। এলাবোরেট জামাকাপড়ের একজিবিশন, বেহিসেবি খাবার, আর দেদার আড্ডা, এক্কেবারে হয়নি। বেপরোয়া প্রবাসী বাঙালিরা আর নিজেদের ধরে রাখতে পারছে না।

অফিস কাছারিতে বেশি হইচই নেই। চাকরি থাকাটাই যেখানে প্রোমোশনের বাড়া। ছেলেমেয়েরা এদিক ওদিক থেকে এসে সব ঘর দখল করে নিয়েছে। ঠিক যেভাবে ট্রেন লেট হলে নিউ দিল্লি স্টেশনের অবস্থা হয়। চারিদিকে বই খাতা, জামাকাপড় ইত্যাদি নানাবিধ সরঞ্জাম নিয়ে বাড়ি এক্কেবারে গঙ্গাসাগর মেলার মত অবস্থা। বিদ্রোহী বাঙালি বাড়িতে বন্দী।

অনলাইন ক্লাস চলছে রাতদিন। বাড়ি, না কল সেন্টার বোঝা মুশকিল। বাড়িতে ব্যান্ডউইথ-এর প্রচুর অভাব। সে টেকনিক্যাল ভাষায় বলা বা পরিবারের একে অপরের কথা বলা বা শোনার ধৈর্য দুটোতেই তার প্রকাশ পাচ্ছে। করোনার ব্যাপারে প্রত্যেকে পিএইচডি করে ফেলেছেন। করোনার

প্রভাব ধীরে ধীরে মন থেকে সরে যাচ্ছে। নতুন কিছুর খোঁজে, বাঙালি এখন মরিয়া। তাই মা দুর্গার ওপর এত ফোকাস।

ঘন ঘন কনফারেন্স কল হচ্ছে। ২০২০তে কিছু নতুন ট্রেন্ড চালু হয়েছে যা কেউ খুশি নন। শুভজিত আর জয়ন্ত মিলে কারো কথা বলার আগেই প্রতিমা স্পনসর করে ফেলেছিল। সেটা কেউই ভালো মনে নেয়নি। এইবার তাই সবাই সজাগ। কারণ বড় স্পনসর মানেই মায়ের বেশি আশীর্বাদ। সেটা থেকে কোন বঙ্গসন্তানই বঞ্চিত হতে চান না।

এইবার তাই পুরো লিস্ট তৈরি হচ্ছে। প্রতিটি আইটেম—প্রতিমা থেকে, ফুল, ফল, মিষ্টি, ঢাকি, পুরুত মশাইয়ের পোশাক কোনোটাই বাদ যাচ্ছে না আলোচনা, পর্যালোচনা থেকে। বোম্বে থেকে পারমিতা মিত্র পুরো ব্যাপারটা কো-অর্ডিনেট করছেন। তাকে বিদ্রোহী বাঙালিরা বিশ্বাস করে তার স্পষ্ট কথার জন্যে। তিনি বলেছেন, কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের আইভি লীগের যে কোর্সটা উনি করেছিলেন, সেটা প্রতি পদে ওনাকে প্রয়োগ করতে হচ্ছে। এলাহি ব্যাপার।

আরও কথা বাড়াবার আগে এই বিদ্রোহী বাঙালির সমষ্টিকে পরিচয় করিয়ে রাখা ভালো। গ্রুপে তিন ধরনের লোক আছে। সিদ্ধান্ত নেন যারা, তারা হচ্ছেন অশোক স্তম্ভের তিন সিংহী—পারমিতা মিত্র, রিমা গাঙ্গুলি আর চিত্রা সেন। এই তিন সিংহী, সব কোণে নজর রাখেন এবং মায়ের আচরণীয় কোনো রীতি, রেওয়াজ এনাদের সম্মতি ছাড়া অসম্ভব।

এদের মধ্যে সবার প্রিয় রিমা গাঙ্গুলি। সবাই তাকে যেমন ভালোবাসে আবার ভয়ও পায়। এই বিদ্রোহী বাঙালি পরিবারের তিনি প্রাণশক্তি আর উচ্চাশার কেন্দ্রবিন্দু। পারমিতা মিত্রর কথা আগেই বলেছি, তার আর একটা পরিচয় আছে। ওকে সবাই নিজের বাড়ির ছোটো মেয়ে হিসেবে দেখায় তার অবস্থা মাঝে মাঝে খুব সঙ্গীন হয়ে পড়ে। সবার ভালোবাসা-অভিমানের ভার তাকে খুব সাবধানে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। পড়ে রইল চিত্রা সেন। তিনি পুজোর কাজ করেন ঠিকই। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই করে থাকেন।

কাজের কাজ যেটা বলে সেটাই কম করেন। তার ধারণা, তিনি অনেক কাজ করেন। বিদ্রোহী বাঙালি তা করে না। যার ফলে তার সিংহী উপাধি মাঝে মাঝে অনিশ্চিয়তার মধ্যে পড়ে যায়। তখন পারমিতা মিত্র তার অপরিসীম ক্ষমতা দিয়ে আবার সবাইকে একসাথে নিয়ে আসেন।

তবে এই কথা হলফ করে বলা যেতে পারে, যে এই তিন সিংহী ব্যতীত, এই পুজো হওয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয় ধরনের লোক যারা, তারা হচ্ছেন পদাতিক সৈন্য। আজ্ঞা মতো কাজ করেন আর মায়ের কাজ করেই তারা আনন্দ পান। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণা সত্তর বছরের সবার প্রিয় চ্যাটার্জি মাসিমা। উনি এই মহামায়ার পূজার রীতি নীতি, আচার অনুষ্ঠানের নিষ্ঠা এত ভালো করে জানেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এর কোনো বিষয় থাকতো, ওনার নম্বর ছোঁওয়া অসম্ভব হত। আরও অনেকে আছেন, যেমন মল্লিকা দত্ত, শিউলি ঠাকুর, অর্পিতা বসু। শেষ তিনজনের নাম করলাম, তারা এনসিআর-এর স্বনামধন্য স্কুলের শিক্ষিকা। স্কুলে এনারা চামুণ্ডি রূপে পরিচিত। বাঘে গরুকে এক ঘাটে এরা জল খাওয়ান। তাই বোধহয় সেই প্রায়শ্চিত্ত করতে বছরে মায়ের কাজ করে এরা নিজেদের আত্মার তুষ্টি করে থাকেন। এদের পুজোর ক'টা দিনের রূপ আর স্কুলের ক্লাসের রূপ এক্কেবারে আলাদা।

তৃতীয় সমষ্টিতে যারা আছেন তারা কোনো কাজ না করে বাইরে থেকে আনন্দ উপভোগ করেন। আগেকার দিনে জমিদারের মোসায়েবের দলে তারা পড়তেন। তাদের কোনো বক্তব্য থাকে না। যেদিকে পাল্লা ভারি সেই দিকে তারা হেলে পড়েন। তাদের ছাড়াও যায় না, আবার ধরাও যায় না। নির্দল প্রার্থী হয়ে তাদের হৈ হৈ করা আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া কোনো কাজই নেই। এই গ্রুপে দুজনের নাম আগেই বলেছি, জয়ন্ত দত্ত আর শুভজিৎ গাঙ্গুলি। ২০২০-তে তারা যে পরিমাণ গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছিল, এটা এদেরই সাজে। এদের ছাড়া বাকিদের নাম না করাই ভালো, তাতে আবার বাকযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।

পুজোর কথাতে আবার ফেরা যাক। আগেই বলেছি, প্রতি পদে চিন্তা ভাবনা

করে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই প্ল্যানিং যতটা স্ট্রং ততটাই পল্‌কা। প্রতি তিন দিনে আবার শূন্য থেকে শুরু হচ্ছে। পুজোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কি হবে সেই ব্যাপারে গভীর আলোচনা চলছে। বাঙালি এই ব্যাপারে ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। 'সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ আর চেতনায় নজরুল'। তাই, প্রত্যেকেই বোদ্ধা আর প্রচুর মতামত। কিভাবে নতুনের সাথে পুরনো মেশানো যায় যাতে বিভিন্ন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাই নিয়ে প্রচুর তর্ক চলছে। এখনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসা হয়নি। তবে আশা করা যাচ্ছে মাস তিনেকের মধ্যে হয়ে যাবে।

ওদিকে কৈলাস অ্যাপার্টমেন্টে মা দুর্গা শিব ঠাকুরকে বলছেন 'দেখেছো এই সবে এলাম। এখনই এরা আবার আমার যাওয়ার পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে। প্রতিবার বলি কম খাওয়া। কোনো কথা এরা শোনে না। চার দিনে যা খাইয়ে দেয়, পুরো এগারো মাস লাগে আমাকে ডিটক্স করতে।'

শিব ঠাকুর স্মিত হেসে বলে, 'গিন্নি একটা ব্যাপার ভেবে দেখো। স্থান, কাল নির্বিশেষে এই বিদ্রোহী বাঙালি তোমাকে আঁকড়ে ধরে আছে। তোমাকে ঘিরেই ওদের যত আনন্দ, রাগ, অভিমান, পৌষফাগুনের পালা। তুমি ওদেরই পরিবারের একজন। ওরা তোমাকে নিজেদের জীবন থেকে আলাদা করতে পারেনি আর পারবেও না, সে পৃথিবী যতই ডিজিটাল হতে থাকুক। এটা কি কম পাওয়া!'

মা তৃপ্তির হাসি হেসে, গ্রীন টি-তে চুমুক দিলেন। ❑

যাচ্ছেতাই

'আজ কিন্তু আবার গ্রাম উদ্ধার করতে যেও না। বিকেলের গাড়িতে ইন্দু, জামাই আর নাতনিরা আসছে। মনে আছে তো?' রান্নাঘর থেকে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন বিমলা দেবী মাস্টারমশাইয়ের উদ্দেশ্যে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ গিন্নি, মনে আছে।' এই কথা বলে বিক্রম মাস্টার মশাই আবার পড়ানোর কাজে মন দিলেন।

বিক্রম মুখার্জি মাস্টারমশাইয়ের আসল নাম। বাবা-মা অনেক যত্নে নাম রাখেন। তারপর সময়ের সঙ্গে সেই নাম অন্য নামে পরিণত হয়। হুগলির হরিদেবপুর গ্রামে বিক্রমবাবুকে মাস্টারমশাই নামেই চেনে। তিনি গ্রামের ভবানীদেবী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন বহু বছর। নামের মধ্যে যে পৌরুষত্ব প্রকাশ পায়, তা ওনার কোনোদিনই ছিল বলে মনে হয় না। ওনাকে কেউ কোনোদিন রাগতে দেখেনি।

স্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন বহুদিন। কিন্তু কাজ থেকে নয়। এখন বাড়ির উঠোনই তার নতুন খেলাঘর। সকালবেলা গ্রামের খান কুড়ি ছোটো ছেলেমেয়ে জড়ো হয় তার পাঠশালায়। পড়াশুনো তো হয়ই, তার সাথে মেলে মুড়ি আর গুড়। আর ভাগ্য ভালো থাকলে, একটু নারকেল কুচি। বিক্রমবাবু দুর্গা মায়ের মতো দশভূজা। সব বিষয়ই ছোটদের পড়িয়ে দেন। সে অঙ্কই হোক, ইংরেজিই হোক বা ভূগোল, ইতিহাসের তত্ত্ব কথা। গল্পের ছলে প্রতিটি বিষয় তিনি

ছোটদের বুঝিয়ে বলেন। তারা অপার বিস্ময়ে অবাক হয়ে শোনে। সে যত দুরন্তই হোক না কেন। মাস্টারমশাইয়ের গল্পে সবাই অভিভূত ও মগ্ন।

গ্রামের সমৃদ্ধ পরিবারের ছেলেমেয়েরা তার পাঠশালায় বড় একটা আসে না। কিন্তু নাপিত, মুচি, মেথর, মাঝি তাদের ছেলে মেয়েদের এটাই খেলার জগৎ। অনেকে এই সুযোগে ছেলেমেয়েদের রেখে কাজেও যায়। টেঁপা, ছেনো, পুটু, পদা, সোনা, রূপা, বাপি, তারক, বিশু এই কচিকাঁচাদের নিয়েই বিক্রম মাস্টারের চাঁদের হাট। এদের মধ্যে বেশির ভাগই অর্থনৈতিক চাপে পড়াশুনো ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু উল্কার মতো একটা দুটো এসে পড়ে যারা এই দরিদ্রতার সীমারেখা ছাড়িয়ে কলকাতা শহরে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা করে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হুগলি জেলার বর্তমান জেলাশাসক আসলাম বেগ। আসলামের বাবা ওর জন্মাবার আগেই গত হন। মা জাহানারা লোকের বাড়ি কাজ করে ছেলেকে মানুষ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা আসলামকে থামাতে পারেনি। মাস্টারমশাইয়ের কাছে প্রাইমারি স্কুলের হাতেখড়ি শেষ করে, সে সোজা ডিস্ট্রিক্ট স্কুলে ভর্তি হয়। স্কলারশিপ পেয়ে এবং খুব ভালো ফল করে। পরবর্তীকালে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে সেই হুগলি জেলারই জেলাশাসক হয়ে এসেছেন। এই সংবাদ শোনার পর বিক্রম মাস্টার মনে করেন তার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার তিনি পেয়ে গেছেন।

স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা আসে না। কিন্তু তাদের পরিবারের গুরুজনেরা মাস্টারমশাইকে খুব সম্মান করেন। তার কারণ দুটি। প্রথম, বিক্রমবাবু তাদের ছোটোবেলায় বহুজনেরই তার প্রাইমারি স্কুলে হাতেখড়ি করিয়েছেন। কালে-দিনে আসলাম বেগের মতো না হোক তাদের মধ্যে কয়েকজন খুব প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। সেইজন্যে তারা মাস্টারমশাইকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। দ্বিতীয় কারণটা আরও সুন্দর এবং বিচিত্র।

আজ থেকে বহু বছর আগে, এই গ্রামেই মাস্টারমশাই প্রথম বিধবাবিবাহর প্রচলন করেন। মাস্টারমশাইয়ের বর্তমান স্ত্রী বিমলা দেবীর পিতা রণজয় দত্ত

ছিলেন মাস্টারমশাইয়ের অঙ্কের শিক্ষক। রণজয়বাবু তরুণ বিক্রমবাবুকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে তার অনেক ধার-দেনা হয়ে যায়। সেই ধার মেটাতে না পারায়, বিমলা দেবীকে একটি ব্যবসায়ীর সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। দুর্ভাগ্যবশত বিয়ের কয়েকদিনের পরেই হার্ট ফেল করে সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক মারা যান। শ্বশুরবাড়ি মেয়েকে অপয়া বলে ফিরিয়ে দেয়। রণজয়বাবু অথৈ জলে পড়েন। পিতৃস্থানীয় শিক্ষকের এই অবস্থা বিক্রমবাবু মেনে নিতে পারেননি। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, বিমলাদেবীকে বিয়ে করবেন। আর যা ভাবা, তাই কাজ। এতে রণজয়বাবু বোধহয় তার সর্ব শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা পেয়ে যান। কিন্তু মাস্টারমশাইকে গ্রামের সব ব্রাহ্মণ পরিবার একঘরে করে দেয়। এমন কি তার নিজের বাবা-মা তার সাথে সম্পর্ক রাখা বন্ধ করে দেন। কিন্তু বিক্রমবাবু তাতে নড়েননি। বিমলা দেবীর হাত ধরে এই গ্রামেই তাদের ছোট্ট সংসার পাতেন। গ্রামে প্রাইমারি স্কুলে চাকুরি করেন। রণজয়বাবু যতদিন জীবিত থাকেন, তার সেবা শুশ্রুষা করেন।

এই ঘটনা গ্রামের প্রবীণেরা অনেকে ক্ষুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও, গ্রামের যুবকরা বিক্রমবাবুর পাশে এসে দাঁড়ান। সময়ের সাথে সাথে এই যুবকরাই গ্রামের মাথা হয়ে ওঠে। বিক্রম মাস্টার আর বিমলা দেবীর শুভ পরিণয় হরিদেবপুর গ্রামে খুব সুপ্রভাব ফেলে। পরবর্তী কালে বহু ভিন্ন বর্ণের বিবাহ প্রচলন হয়। আর সেইসব বিবাহে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করতে মাস্টারমশাই আর বিমলা দেবীকে সবসময়ই যেতে হয়। মাস্টারমশাই কালে-দিনে গ্রামের অলঙ্কার বা অহঙ্কার হয়ে ওঠেন। হরিদেবপুর মানেই বিক্রম মাস্টার। শোনা যায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস গ্রামের পঞ্চায়েত বহুবার আর্জি জানিয়েছে যাতে স্টেশনটার নাম হরিদেবপুর থেকে বিক্রমপুর করা হয়। তার কোনো উত্তর অবশ্য এখনো আসেনি। তবে পঞ্চায়েত হাল ছাড়েনি।

এবার মাস্টারমশাইয়ের পরিবারের বাকি সদস্যের কথায় আসা যাক। বিমলা দেবী মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী'র কথা আগেই বলেছি। তিনি গ্রামে মা ঠাকুরণ নামে পরিচিত এবং সম্মানিত। তবে বিমলা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে একটা অন্য

দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তিনি আজও বুঝে উঠতে পারেননি বিক্রম মাস্টার তাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন নাকি গুরুদক্ষিণা দিয়ে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর যদি তাই হয়, তাহলে ওই ব্যবসায়ীর সাথে কয়েকদিন ঘর করারই বা কি দরকার ছিল। বিক্রমবাবু তো আগেই জানতেন রণজয়বাবু দেনায় জর্জরিত। তখনই কেন বিমলা দেবীর সাথে বিয়ে করতে চাননি। তাহলে গ্রামে এতটা লোক হাসানো হতো না।

আরও একটা বড় কারণ আছে। বিক্রমবাবু কোনোদিন উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন না। প্রাইমারি স্কুলে যে কটা টাকা মাইনে পেতেন, তাতে টেনেটুনে মাসের পনেরো দিন চলে যেত। মাস্টারমশাই অবশ্য অনেক প্রাইভেট ট্যুইশন করতেন। কিন্তু তাতে কোনো নিশ্চিত আমদানি হতো না। যে যেমন পারত, কিছু দিত। একদিনের মাছ, বাগানের সবজি, গাছের আম, কলা ইত্যাদি। কিন্তু কে পয়সা দিলো আর কে দিলো না কোনোদিন বিক্রমবাবু খেয়াল রেখে উঠতে পারেননি। তাই এই নিষ্ঠুর সংসারের জোয়াল টানতে বিমলা দেবীর নাভিশ্বাস উঠে যেত। বিক্রম মাস্টারের তাতে কিছু যেত আসত না। তাকে এক পদ দিয়ে খেতে দিলেও যেমন হাসি মুখে খেতেন, পাঁচ পদ দিলেও একই অভিব্যক্তি। সংসারের এই অবস্থার কথা যখনই বিক্রমবাবুকে বলতে গেছেন, 'গিন্নি দেখো একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।' দৈন্যতার দিন শেষ হয়নি। তবে একটা আশার আলো দেখা গেছে। সেই আশার আলো এনেছে ওদের মেয়ে ইন্দুমতি।

ইন্দুমতি গ্রামের প্রাইমারি স্কুল থেকে পড়াশুনো শেষ করে। সেও আসলামের পথ ধরে বৃত্তি পেয়ে ডিস্ট্রিক্ট স্কুলে যায়। সেখান থেকে ভালো নম্বর পেয়ে কলকাতাতে পাড়ি দেয় উচ্চ শিক্ষার জন্যে। পড়াশুনো ঠিক সময়ে শেষ করে, ইস্টার্ন রেলওয়েতে ভালো চাকরি পেয়ে যায়। সরকারি দফতর হওয়া সত্ত্বেও, তার কাজ অল্পদিনের মধ্যেই সবার নজর কাড়ে। এবং সে উন্নতির সোপানে পা রেখে ক্রমশ উপরে উঠতে থাকে। ইন্দুমতি উন্নতির সাথে সাথে মা-বাবার কিছু দায়িত্ব নিতে শুরু করে। গ্রামের ভেঙে পড়া বাড়িটা ঠিক করা। মাস্টারমশাইকে একটা বইয়ের আলমারি, চেয়ার টেবিল কিনে দেওয়া। বিমলা দেবীকে ভালো

কয়েকটি শাড়ি, রান্নার বাসন ইত্যাদি। মেয়ের হাত থেকে বিমলা দেবী কাঁচা টাকা নিতেন না। ইন্দুমতি বুদ্ধিমতী। সে জানে বাবা জানলে দুঃখ পাবে। তাই সেই স্পর্ধা সে কোনোদিন করেনি। বিমলা দেবীও কোনোদিন চাননি।

একবার কি একটা কাজে ইন্দুমতি, রাইটার্স বিল্ডিং-এ মিটিং করতে গিয়ে ঈশান সিনহা বলে এক রেভেনিউ অফিসারের সাথে আলাপ হয়। ঈশান বিহারের ছেলে। ওর বাবা পাটনা পোস্ট অফিসের পিওন ছিলেন। একই মানসিকতার জন্যে খুব তাড়াতাড়ি ওদের মধ্যে সুন্দর বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এবং সেখান থেকেই শুভ পরিণয়। বিক্রমবাবুর তো কোনো আপত্তি ছিল না। বিমলা দেবীর ছিল। তিনি তার নিজের প্রথম জীবনে সমাজের উপেক্ষা করার কথা ভুলতে পারেননি। বিয়ের কিছুদিন পরেই ওদের সুন্দর দুটি যমজ কন্যাসন্তান জন্মায়। তাদের আদরের নাম বিক্রমবাবু দেন টাপুর আর টুপুর। ভালো নাম দৃষ্টি আর দময়ন্তী সিনহা। তাদের বয়স এখন পাঁচ বছর। নাতনি হবার পরে বিমলা দেবীর রাগ কমলেও ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। এখানেও তিনি বিক্রমবাবুকে পাশে পাননি। মনে মনে রেগে বহুবার বলতেন এক্কেবারে 'যাচ্ছেতাই' মানুষ।

এবার মূল গল্পে ফেরা যাক। বিক্রমবাবু খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতেন। উঠে হাতমুখ ধুয়ে, সেইদিন কি পড়াবেন সেইগুলো একবার পড়ে নিতেন। তারপর নিজে হাতে উঠোনটা পরিষ্কার করে, নিজের চেয়ার-টেবিল গুছিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্যে অপেক্ষা করতেন। একে একে তারা আটটার মধ্যে এসে পড়ত। তারপর শুরু হতো পড়া। টাইম টেবিল একটা ছিল ঠিকই। কিন্তু সেই টাইম টেবিল কোনোদিন মানা হতো না। দুটি কি বড়জোর তিনটি বিষয় পড়ার পরেই, বাচ্চারা খিদেতে ছটফট করত। তখন তারা পেত মুড়ি-গুড় আর কখনো কখনো তার সাথে কলা বা নারকেল।

মাস্টারমশাই সবাইকে ভালোবাসতেন কিন্তু বর্তমানে সবচেয়ে ভালোবাসতেন বীথি বলে মধু ডোমের মেয়েটিকে। এক্কেবারে সাক্ষাৎ সরস্বতীর বরপুত্রী। প্রতিটি বিষয়ে খুব পরিষ্কার মাথা আর তেমন উপস্থিত বুদ্ধি। এবং তেমনি নরম স্বভাব। মাস্টারমশাইয়ের সাথে লেগে থাকে। 'গিন্নি দেখো,

বীথি মা-ও আমার বড় দৌড়ের ঘোড়া, কালে-দিনে অনেক নামডাক করবে।' ইন্দুমতী চলে যাওয়ার পর আবার একটি ইন্দুকে কাছে পেয়ে বিমলা দেবীরও সময় ভালো কেটে যেত। তবে আজকে বিশেষ দিন। জামাই ঈশান, মেয়ে ইন্দু, নাতনি টাপুর-টুপুর কয়েকদিন গ্রামে থাকতে আসছে। সেই উপলক্ষে বিমলা দেবী ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন সত্যনারায়ণ পুজো করবেন। বহুদিন বলে রেখে ছিলেন হরিদেবপুরের বিষ্ণু মন্দিরের পুরোহিত সান্যাল মহাশয়কে যেন খবর দেওয়া হয়। গ্রামের প্রায় সবাই নিমন্ত্রিত। হাট বাজার যা করার তা মেয়ে আগের সপ্তাহে এসে ব্যবস্থা করে গেছে। সবাইকে নিমন্ত্রণও করা হয়ে গেছে। কিন্তু পুরোহিতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মাস্টারমশাইয়ের ওপর। ইন্দু বলেছিল সেটাও করে দেবে। কিন্তু বিমলা দেবী মেয়েকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল, 'দেখি ওর আমার কথা মনে থাকে কিনা।'

অঙ্কের নিয়ম মাফিক মাস্টারমশাই সেই কথা পুরো ভুলে গেছেন। সেটা সাহস করে স্ত্রীকে বলে উঠতে পারেননি। তাই সেদিন তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করার চেষ্টা করছিলেন। যাতে মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতকে ধরতে পারেন। ছেলেমেয়েদের বিদায় দিয়ে মন্দিরের উদ্দেশ্যে বেরোতে যাচ্ছেন এই সময় রফিক মিঞা এসে হাজির। 'মাস্টার খুব দরকার। একবার বাড়িতে চলো।' 'আজ আমি যেতে পারব না রফিক, আজ আমার অনেক কাজ।' রফিক নাছোড়বান্দা 'তোমায় যেতেই হবে। দশ মিনিট। তারপর যেখানে ইচ্ছা যাও।' মাস্টার মশাইয়ের জেদ এক মিনিটে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

হাঁক ছেড়ে বললেন, 'গিন্নি আমি এগোচ্ছি', বলে বেরিয়ে গেলেন। বিমলা দেবী দুজনকে বেরিয়ে যেতে দেখে আবার বললেন, 'যাচ্ছেতাই'। রফিকের বাড়িতে খুব ঝামেলা শুরু হয়েছে। মেয়ে নূরের নিকাহ ঠিক হয়েছে পাশের গ্রামের স্টেশন মাস্টার জাহির শেখের সাথে। রফিকেরও এক মেয়ে। ডিস্ট্রিক্ট স্কুলের মাস্টার। তার খুব ইচ্ছে মেয়ের নিকাহ খুব ধুমধাম করে দেয়। তার জন্যে সে তার অর্ধেক পৈতৃক জমি বাঁধা দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু বাধ সাধছে বেগম মুমতাজ আর মেয়ে নূর। তাদের কথা, এখন জমি বাঁধা দিয়ে এইসব করা ঠিক

নয়। তার থেকে যা সামর্থ্য তা দিয়েই নিকাহ হবে। কোনো সিদ্ধান্তে না পৌঁছতে পারায়, বেগম মুমতাজ মাস্টারমশাইকে তলব করেছে এর সুরাহা করে দিতে। আগেই বলে রাখি, রফিক আর বিক্রমবাবু বাল্য বয়সের বন্ধু। যখন বিমলা দেবীর সাথে বিক্রমবাবুর বিয়ে হয়, তখন যাতে গ্রামের মুসলমান পরিবার বিক্রমবাবুর পাশে দাঁড়ায়, সেই ব্যবস্থা রফিক করেছিল।

রফিকের বাড়ির উঠোনে কিছু মানুষের সমাগম হয়েছে। বেশিরভাগই ওদের পরিবারের লোক। মাস্টারমশাই যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, সসম্মানে তারা মাস্টারমশাইকে জায়গা করে দেয়। দুই পক্ষও তাদের আর্জি পেশ করে। মাস্টারমশাই তাদের কথা শুনলেন। যারা এসেছিলেন তাদের কথাও শুনলেন। তারপর সবার সামনে রফিকের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গের হাসি ছুড়ে বললেন, 'এই তুমি আমার বন্ধু। ভাবি তো ঠিক কথাই বলেছে। তোমার মেয়ে নিজে স্বয়ং সম্পূর্ণা। আর তুমি তাকে পণ্য করে জামাইয়ের হাতে তুলে দিতে চাও। এরপর তোমার সম্মান থাকে না তোমার মেয়ের সম্মান থাকে? এর থেকে ভবিষ্যতে তোমার জমি মেয়ের নামে লিখে দিও। খবরদার জমি বিক্রি করবে না।' সবারই কথাটা খুব মনে ধরে। এরপর রফিকের আর কথা বলার সাহস থাকে না। মুমতাজ বেগম আর নূর খুশিতে আটখানা। এক থালা খাবার নিয়ে এসে বললে, 'বেলা তো অনেক হলো মাস্টারমশাই এইটুকু আপনাকে খেয়ে যেতে হবে।' মাস্টারমশাই না না করেও খেতে বসে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ বিমলা দেবীর কথা মনে পড়ে যায়। 'ইস্, দেখো, আসল কাজই ভুলে গেছি। তাড়াতাড়ি তোমার সাইকেলটা দাও রফিক। ভাবী, পরে এসে খেয়ে যাব। তোমরা আজ তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ি চলে যেও।' বলে ঝড়ের গতিতে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তখন ঘড়িতে প্রায় তিনটে। সূর্যদেব মধ্যগগনে থেকে বহুক্ষণ সরে গেছেন। সেই সূর্যকে ধরার গতিতেই সাইকেল চালিয়ে মাস্টারমশাই মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। বিষ্ণু মন্দির যাওয়ার একটাই রাস্তা যেটা স্টিফেন ডিসুজার বাড়ির পাশ দিয়ে যায়। স্টিফেন আর তার পরিবার কিভাবে এই গ্রামের এসে পড়ে কেউ জানে না। তার নাম গ্রামের মানুষ উচ্চারণ করতে

না পারায় তাকে সবাই 'টিফিন' ডিসুজা বলেই ডাকতো। স্টিফেন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে জজ সাহেবের গাড়ি চালাতেন। ওরা কয়েকঘর খ্রিস্টান গ্রামের এই পাড়াতে থাকে। কয়েক বছর আগে স্টিফেন মারা যায়। তার দুই ছেলে টম আর ফ্রান্সিস ডিসুজা তারাও ড্রাইভার। কিন্তু তাদের মধ্যে এখন পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে প্রচুর অশান্তি শুরু হয়েছে। স্টিফেন ডিসুজার স্ত্রী মেরি ডিসুজা অনেক কষ্টে ছেলেদের একসাথে বাড়িতে এনে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। পারেননি। ছেলেরা সেই মাস্টারমশাইয়ের প্রাইমারি স্কুলে পড়াশুনো করত। তাই মেরি অগতির গতি, মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির দিকে বেরোতে যাবে, সামনেই দেবতার মতো মাস্টারমশাই নিজে সাইকেল বাহনে আবির্ভূত। 'এ তো মেঘ না চাইতেই জল!' প্রায় রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি। বিক্রম মাস্টার কোনোরকমে ব্রেক কষেন।

'বিক্রমবাবু আপনি আমাকে বাঁচান।' বলে মেরি ডিসুজা ওনার হাতদুটো জড়িয়ে ধরেন। 'আরে কি মুশকিল, কি হয়েছে?' এক নিশ্বাসে পুরো ঘটনাটা বলে ফেললেন মেরি। বিক্রমবাবু স্তম্ভিত। 'চলো দিদিভাই, তোমার বাড়িতে তো আমাকে যেতেই হচ্ছে।' বাড়িতে ঢুকতেই টম আর ফ্রান্সিস শশব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাস্টারমশাই সেই কালজয়ী হাসি দিয়ে ওদের সম্বর্ধনা করলেন, 'আরে টম আর ফ্রান্সিস, বাবারা তোরা কেমন আছিস। এই তোদের মায়ের সাথে কথা হচ্ছিল। দিদিভাই ঠিক করে ফেলেছে, এই জমি জায়গার দায়িত্ব থেকে উনি মুক্তি পেতে চান। তাই ওনার অবর্তমানে, এই জমি ব্যান্ডেল চার্চ সোসাইটিতে দান করে দেবে। যাতে ভবিষ্যতে এখানে একটা ভালো চার্চ তৈরি হয়। তোদের নিশ্চয়ই কোন আপত্তি নেই, কি বল?'

টম আর ফ্রান্সিস হতবাক। মাস্টারমশাই বলে চললেন, 'সবাইকে অনেকগুলো পাশ দিয়ে কেউকেটা হতে হবে তা নয়। তবে ভালো মানুষ সবাই হতে পারে। তোদের মা এখনো জীবিত। কোথায় তার সেবা করবি না তোরা এই জমি নিয়ে আইন, আদালত শুরু করে দিলি? আমি তোদের এই শিক্ষা দিয়েছিলাম? তোরা কি করবি আমি জানি না। তবে দিদিভাইয়ের অবস্থা দেখে

খুব দুঃখ পেলাম।' তারপর বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল। ভায়েরা কথা দিল, আর কোনোদিন এই কাণ্ড করবে না। মিলেমিশে থাকবে। এইসব যখন শেষ হল, তখন বেলা প্রায় শেষ। বিক্রম মাস্টার টনক নড়লো, 'আরে আমার তো সান্যাল মশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে! মেয়েটাকেও তো স্টেশন থেকে আনতে হবে!' ছিটকে মেরি ডিসুজার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। সাইকেল চালাতে চালাতে চিৎকার করে বললেন, 'দিদিভাই তোমরা বাড়িতে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেও।'

বিক্রম মাস্টারের হিসেবে যদি দিন চলে, তাহলে সেই দিনের আটচল্লিশ ঘণ্টাও হয়তো কম পড়বে। বিষ্ণু মন্দিরে পৌঁছে, দেখলেন একটাও জনমানুষ নেই। দেবতার দর্শন তো দূরে থাক, সান্যাল মশাইকে কোথাও দেখা পেলেন না। আর তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। মন্দিরের দালানে বসে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

'ঠাকুর তোমার আরাধনা করার যোগ্যতা আমার নেই।' বার বার বিমলা দেবীর কথা মনে পড়তে লাগলো। 'সারা জীবন ও কিছুই চায়নি আমার কাছে। শুধু একবার একটা কাজ করতে বলেছিল, তাও করতে পারলাম না। আমাকে তুমি কোনোদিন ক্ষমা কোরো না ঠাকুর।' বলে বার বার নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। কতক্ষণ বসে ছিলেন নিজেরই খেয়াল নেই। হঠাৎ ওনার মনে পড়লো আজ তো খাওয়া হয়নি। শরীরটা খুব ভারী লাগতে লাগলো। কোনোক্রমে নিজেকে সামলে, বাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা নেমেছে। বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখেন বিশাল ভিড়। পুলিশের গাড়ি। আর পেল্লায় পেল্লায় কয়েকটা সরকারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বুকটা ধড়াস করে উঠলো। সবাই ঠিক আছে তো? বিমলার কিছু হয়নি তো? এই ভাবতে ভাবতে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই পুলিশ পথ আটকালো। তারপর ওনার পরিচয় পেয়েই শশব্যস্ত হয়ে রাস্তা ছেড়ে দিলো। বাড়ির উঠোনে ঢুকেই সান্যাল মশাই এসে মাস্টারমশাইকে সম্বর্ধনা করলেন। 'আরে মাস্টারমশাই আমি তো তখন

থেকে এসে বসে আছি। গতকাল মধু আর তোমার বীথি গিয়ে হাজারবার বলে দিয়ে এসেছে আজ নাকি তাড়াতাড়ি যাওয়া চাই। আমাকে পাঁচটার সময় মন্দির বন্ধ করে এখানে নিয়ে আসতে বাধ্য করেছে।'

পিছন থেকে বীথি বলল, 'আমি তো জানি, তুমি ভুলে যাবে। তাই বাবা আর আমি মিলেই ওনাকে নিয়ে এলাম।' মাস্টারমশাই খুশিতে কেঁদে ফেললেন বীথিকে জড়িয়ে ধরলেন, 'তুই সাক্ষাৎ সরস্বতী। নাহলে তোর এত বুদ্ধি হয় কি করে!'

বীথি বলে, 'আরে আমাকে ছাড়ো। দেখো কে এসেছে।' একটু দূরে মাস্টারমশাই দেখলেন আসলাম বেগ দাঁড়িয়ে। এসে প্রণাম করে বলল, 'কেমন আছেন মাস্টারমশাই?' এতো শুভ দিনে আপনার বাড়িতে আসতে পারব ভাবিনি। আমি দুটো খবর দিতে এসেছি। এক, হরিদেবপুর নাম পরিবর্তন করে বিক্রমপুর স্টেশন মঞ্জুর হয়ে গেছে। দুই, আমি আমার তরফ থেকে মা ঠাকুরণের জন্যেও একটা তাম্র পত্রের সম্মান স্মারকের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। আপনি এতো কাজ কোনোদিনই করতে পারতেন না, যদি না মা ঠাকুরণ সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী হয়ে আপনার পাশে থাকতেন। সামনের মাসে ডিস্ট্রিক্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসে আপনাদের দুজনকেই সম্মানিত করা হবে। আর স্টেশনের নামও বদল করা হবে। ভাবলাম খবরগুলো নিজে দিয়ে আসি। আজ আমি আর বসতে পারব না। অনেক কাজ, পরে সময়সুযোগ করে সপরিবারে আসব।'

মাস্টারমশাই দুই হাতে আসলামকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি ভাবতে পারছেন না এটা কি স্বপ্ন! নাকি সত্যি ঘটছে!!

আসলাম পুলিশের গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। মাস্টারমশাই আবার নিজের বাড়ির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। একটু দূরে দেখলেন নূর আর ইন্দু মিলে রান্নাঘর সামলাচ্ছে। জামাই ঈশান আর ফারুক মিলে অতিথিদের অভ্যর্থনা করছে। মুমতাজভাবী আর বিমলা মিলে পুজোর জোগাড়যন্ত্রে ব্যস্ত। টম আর ফ্রান্সিস শতরঞ্চি পেতে অতিথিদের বসবার ব্যবস্থা করছে। মেরি দিদিভাই তার চাঁদের হাটে বসে বাচ্চাদের খেয়াল রাখছেন। টাপুর টাপুর ওদের সাথেই খেলে

বেড়াচ্ছে। ওদের সবাইকে দেখে মাস্টার আর চোখ ফেরাতে পারছিলেন না।

হঠাৎ পাশ থেকে বিমলা দেবীর খুশি আর অভিমান মেশানো গলা শুনতে পেয়ে সম্বিৎ ফিরে পেলেন। 'তুমি কি গো! সান্যাল মশাইকে তো আনতে ভুলেই গেলে! নেহাত তোমার বিড়বিড়ানি শুনতে পেয়ে বুদ্ধি করে টম আর ফ্রান্সিস যদি স্টেশন না যেত, মেয়ে জামাই কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো? তোমার কি কোনো কালেই আক্কেল হবে না? তোমাকে কি বলব বলতে পারো?'

একমুখ হাসি ছড়িয়ে, মাস্টারমশাই জবাব দিলেন 'যাচ্ছেতাই'।

পুনশ্চ: বিক্রম মাস্টারের হরিদেবপুরের খোঁজে আমি বহুদিনই আছি। আমার পাঠকদের কাছে একান্ত আবেদন, যদি হরিদেবপুরের হদিশ পান, আমাকে সত্বর জানাবেন। অধীর আগ্রহে আপনাদের অপেক্ষায় রইলাম। ❑

কালো আর হলুদ

কালো-হলুদ। বা পুরো হলুদ। বিশাল পেট। আর হেলেদুলে চলে বেড়ানো। কলকাতার এবড়োখেবড়ো রাস্তাতে তুমি ছিলে একমাত্র দিশারী। যেকোন পাড়ার, বড় রাস্তার মোড়ে তোমাকে দেখা যেত। রোগা, বিহারের ড্রাইভার, ছিল তোমার সারথি, ঘটাং করে মিটারটা ফেলে গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে যেত। পাওয়ার স্টিয়ারিং ছিল না। শুধু ছিল তার মনের পাওয়ার।

ডেবে যাওয়া, স্প্রিং, নারকেলের ছোবরার সংমিশ্রণ সে এক অদ্ভূত সীট। খুব অসুবিধাজনক। কিন্তু ভ্যাপসা গরমে দরদর করে ঘেমে যাওয়া বাসে না চড়া দ্বিতীয় বিকল্পে এর থেকে ভালো উপায় কলকাতায় ছিল না।

তুমি ছিলে শহর কলকাতার একচ্ছত্র সম্রাট। সে হাওড়া স্টেশন থেকে হাজরা মোড়, আলিপুর থেকে এয়ারপোর্ট। বা বেহালা থেকে বারাসাত। তুমি ছিলে চির আকাঙ্খিত। মধ্যবিত্ত বাঙালি তোমাকে 'ভাগ' করে তোমার করুণার পাত্র হতো। আর যাদের পকেট ছিল ভারি, তুমি তাদের সারা মাস কুর্নিশ করতে।

কোথাও যাওয়া মানেই আনন্দ। আর যদি তুমি সেখানে নিয়ে যেতে। সে যে কি অমলিন অনুভূতি, তা বোঝাতে পারব না। তার রেশ আতর গন্ধের মত বহুদিন মনে লেগে থাকত।

তোমার জানলার কাঁচ উপর-নীচে করবার হ্যান্ডল বেশির ভাগ সময়ই কাজ করত না। তাতে আক্ষেপ ছিল না। কারণ তুমি ছুটলেই সেই এক রাশ হাওয়া ঢুকে মনটাকে জুড়িয়ে দিত।

ছিল না রেডিও। বা সিডি প্লেয়ার। কিন্তু তার প্রয়োজনও হয়নি তখন। চারিদিক তাকিয়ে হাওয়ার ওপর ভর দিয়ে চলাটাই ছিল ভীষণ আনন্দের।

তোমার কদর ছিল সব বয়সে। বড়বাজারের ব্যবসায়ী থেকে বড় কোম্পানির এক্সিকিউটিভ, কিংবা মুমূর্ষু রুগী থেকে নতুন প্রেমিক। সবারই ছিলে চোখের মণি।

আজ যখন কলকাতাতে যাই। তোমাকে বেশি দেখি না। নতুন চওড়া মসৃণ রাস্তায় এখন ওলা-উবেরের খেলা। মুহূর্তে তারা পৌঁছে দেয় শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সুন্দর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায়। পয়সা দেওয়ার জন্যে সেই বিহারি ড্রাইভারের হাসি মুখ দেখতে হয় না। বকশিসের কথাও কেউ বলে না।

যে সময় আর কালের তুমি সাক্ষী ছিলে, তা বিদায় নিয়েছে বহুদিন। বড় রাস্তার ট্রামলাইনের মত তুমিও কলকাতাকে আঁকড়ে ধরে আছো। এই ভেবে যে আবার কলকাতার মানুষ তোমাকে নতুন রূপে নিজেদের মনে জায়গা দেবে।

তাই যেন হয়। এই প্রার্থনা করি। কলকাতায় গেলে আমার চোখ আর মন তোমাকে ঠিক খুঁজে বেড়াবে..... ❑

মহেশের কথা

দুই দিন, দুই রাত, অনেকটা হাঁটা, তারপর ট্রাকের মাথায় চড়ে গফুর মিঞা আর আমিনা কলকাতা পৌঁছল। শিয়ালদহ স্টেশনের সামনে হুমড়ি খেয়ে ট্রাকটা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে, গাড়ি ভর্তি ছাগল আর মানুষ একসাথে নামিয়ে দেওয়া হলো। ছাগলের তো দাম পাওয়া যায়, মানুষের নয়। তাই পশুদের প্রতি যত্নটা বেশি। গফুর আর আমিনা কোনোরকমে নিজেদের ক্লান্ত শরীরটাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ফেলল।

ট্রাকের খালাসি তারক গফুরকে বললে, 'কাকা এইখানে সাবধানে থেকো, তোমার মেয়ের যা রূপ! আমার কথা তো শুনলে না। বলেছিলাম আমার সাথে থাকো, বীরেশবাবুকে বলে তোমাদের একটা হিল্লে করে দিতাম।' বলে আবার সেই বাঁকা হাসি দিয়ে ট্রাকের মাথায় চড়ে বসল। পুরো রাস্তা তার একমাত্র নজর আমিনার ওপর। ঠিক যে ভাবে হিংস্র বাঘ সদ্যজাত হরিণশিশুর দিকে তাকিয়ে থাকে। গফুর কোনোরকমে তারককে মদের খরচ দিয়ে তুষ্ট রেখেছিল। ভয় সে পেয়েছিল। কিন্তু মানুষের পিঠ যখন প্রতিকূলতার দেওয়ালে ঠেকে যায়, তখন কোথা থেকে বিধাতাপুরুষ হঠাৎ সাহস জুগিয়ে দেন। গফুরের তাই অবস্থা।

গত দুইদিন খাওয়া দাওয়া এক্কেবারে হয়নি বললেই চলে। তবে তার একটা উপকার হয়েছে। ক্ষিদে থাকায়, ক্লান্ত শরীরে ঘুমের উপদ্রব হয়নি। সজাগ

হয়ে সে আমিনার ওপর নজর রাখতে পেরেছে। ক্ষিদে থাকার এতো মাহাত্ম্য গফুরের আগে জানা ছিল না।

কলকাতা শহরে এত লোক গফুর আর আমিনা জীবনে দেখেনি। কাশীপুর গ্রামও জনবহুল, কিন্তু এখানে মশামাছির থেকেও মানুষ বেশি। আর আশ্চর্য ব্যাপার, সবার মুখেই ভয় কিংবা অস্থিরতার ছাপ। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এই বিপুল জনরাশি ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক থেকে ওদিক। ঠিক দম দেওয়া পুতুলের মত। কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। বিধাতার কোন অভিশাপে এরা মূক আর বধির হয়ে গেছে। জীবনের যাঁতাকল থেকে পালাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা এদের উদ্দেশ্যবিহীন করে তুলেছে।

খানিকটা এগিয়ে স্টেশনের ধার দিয়ে অনেকগুলি নার্সারির দোকান। সবুজ গাছের চারা দেখে গফুরের মনটা আনচান করে উঠল। একটি দোকানে জাতভাইকে দেখে তার কাছে এগিয়ে গেল।

পথের ক্লান্তি কাটিয়ে শেষ সাহস সম্বল করে গফুর জিজ্ঞাসা করল, 'মিঞা এইখানে একটু খাওয়া আর থাকার ব্যবস্থা হবে?'

হা হা করে হেসে উঠল জাফর ভাই। 'খাওয়া আবার থাকা? বলি তুমি কি আজ আশমান থেকে এলে মিঞা? এই শহরে এক চিলতে জায়গা নেই পা রাখার। আর তুমি চাও দুটোই?'

অপমান গফুর আর আমিনার নিত্য সঙ্গী। তাই মনে লাগার আগেই, পিছলে পড়ে গেল। দুজনে কথা শুনেও স্থির দাঁড়িয়ে রইল।

জাফর ভাই আরও কথাটা বলল ঠিকই, কিন্তু ওদের পাংশু বর্ণ মুখ আর নীরবতা ওকে চাবুক মারল যেন। নিজের দুপুরের খাবার আর জল বাপ-বেটিকে দিয়ে বললে, 'একটু এখানে জিরোও।' পরের কয়েক ঘণ্টাতে গফুর আর আমিনার পুরো জীবন বৃত্তান্ত শুনে নিল জাফর ভাই। গফুর বলতে গিয়ে বহুবার কেঁদে ফেলল। আমিনা বাবাকে সামলালো না। কারণ এইটুকু বয়েসে সে বুঝেছিল—সামনের জীবনের সংগ্রাম যদি জিততে হয়, ভারি মনে তা করা সম্ভব নয়।

কথা শোনবার পর জাফর ভাইয়ের কি হাসি। রাগে জ্বলে গেল গফুর। 'তুমি হাসছ!' জানা গেল, জাফর ভাইয়ের গল্পটাও খুব আলাদা নয়। সেও গফুরের মতো জন্মচাষী। চাষ করতে গিয়ে গ্রামের মোড়লের থেকে মেলা দেনা হওয়া, তারপর গ্রামের মোড়ল তাকে তার নিজের জমি থেকেই চোর অপবাদ দিয়ে উৎখাত করেছিল। শহরে বহু বছর আগে তার পদার্পণ। ভেবেছিল অনেক পয়সা রোজগার করে গ্রামে ফিরে যাবে, চোর অপবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করবে। কিন্তু এই মায়াবী শহর, জীবন সংগ্রামের নেশায় মাতিয়ে রাখায়, গত দশ বারো বছরে সেই সুযোগ দেয়নি। চোখের জল হয়ে গিয়েছিল বাষ্প, মন সময়ের প্রলেপে হয়ে উঠেছিল রুক্ষ। সে এক অদ্ভূত অনুভূতি। গফুর আর আমিনা ঠাহর করতে পারল না। জাফর ভাই বললে, 'চিন্তা কোরো না, তোমরাও হাসতে শিখে যাবে।'

গফুর আর আমিনার একটা ব্যবস্থা কোনোরকমে হয়ে গেল। গফুর মিঞা জাফর ভাইয়ের নার্সারি-দোকানে বহাল হল হেল্পারে। আর আমিনা ওই একচল্লিশটি দোকানের সামনে ময়লা পরিষ্কার করার পরিচারিকা। কোন কাজই ছোট নয়, এই শিক্ষা ওদের কোনো মহিষী দেননি, কিন্তু নির্মম পরিস্থিতি সেই পাঠ তাদের অতি সহজেই শিখিয়ে দিয়েছিল। গাছের ব্যাপারে গফুরের আর আমিনার অগাধ জ্ঞান। এ যেন মাছের সাঁতার জানার মতো ব্যাপার। বহু রকমের সার আছে শহরে। সেটা শিখতে খানিকটা হোঁচট খেতে হয়েছিল। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে তাও আয়ত্ত হয়ে গেল।

ফুল, ফল, সবজি সব গাছের সাথে বাপ-বেটি মিশে যেতে লাগল। ওখানে রটে গেল, গফুর মিঞা আর আমিনা জাদু জানে। ওদের স্পর্শে যে কোনো গাছের নাকি প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। জাফর ভাই যে এক পাকা জহুরি আর গফুরকে খুঁজে পাওয়ার একটা মস্ত গল্প ফেঁদে ফেলল। সবাইকে সন্ধ্যেবেলা তাসের আড্ডায় সে কতভাবে তা ব্যাখ্যান করত তা বলা যাবে না। গফুর মিঞাকে জিজ্ঞাসা করলে, সলজ্জ ভাষায় বলত, 'আমি মুখ্যু মানুষ, কি বা জানি। ওদের আমি গাছ না ভেবে, ছেলে মেয়ের মতো দেখি। তাই হয়ত আল্লা

দয়া করে।' এই কঠিন শহরে, এই সহজ উক্তির মর্ম উদ্ধার করতে হয়ত আর একটি রবি ঠাকুর বা শরৎবাবুর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই শহর বা তার মানুষের সে সময় বা মানসিকতা কোনোটাই পর্যাপ্ত ছিল না। তাই তারা গফুরের কথা হাসিতে উড়িয়ে দিত।

অনেক রকম খরিদ্দার আসত গাছ কিনতে। বেশির ভাগ আলু, পেঁয়াজের মতো গাছ কিনতেন। 'গতবার ডালিয়াগুলো কিন্তু ভালো ছিল জাফর, ঐরকম যেন হয়' বা 'তোমার গোলাপ গাছগুলো তো লাগাবার আগেই শুকিয়ে গেল। বৌদির মান রাখলে না। এবার কিন্তু ফ্রী দিতে হবে।' জাফর ভাই সবার সাথে তাল মিলিয়ে ঠিক রফা করে ফেলত। গফুর আমিনা অবাক হয়ে দেখত। গাছ চেনার থেকে মানুষ চেনা যে শতগুণ কঠিন তা গফুর আর আমিনা হাজারবার স্বীকার করত।

দিনগুলো যেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে টগবগ করে এগিয়ে চলল। নার্সারির সামনের রাস্তা সবসময় পরিষ্কার থাকতো আমিনার নজরদারিতে। গফুর মিঞার নতুন নাম হয়ে গেল গফুর মালি। অন্যান্য দোকানদারদের সাথে ওঠাবসা করতে গিয়ে গফুর জানলো সবার কাহিনীগুলোই তার মতো দোমড়ানো মোচড়ানো ঘটনা। সমাজে উপেক্ষিত, এবং বঞ্চিত মানুষের হাসি কান্নার পালা। এদের কারুরই ফিরে যাওয়ার জায়গা নেই। কল্লোলিনী কলকাতাই তাদের দেশ, তাদের ইহকাল, পরকাল। নদীর ওপর মাঝিবিহীন নৌকোর মতো তারা সময়ের স্রোতে জীবন সমুদ্রের দিকে ধেয়ে চলেছে। এই স্রোত থেকে মুক্ত হয়ে অন্য আশ্রয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

গফুর মিঞা সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকলেও, সকালবেলা তার একটা অভ্যেস ছিল। খুব ভোরে নমাজ পড়ার পর, আশেপাশে যত গরু ছিল তাদের খাওয়াতো। শুকনো গাছের চারা থেকে শুরু করে, খড় ইত্যাদি, নিজের সীমিত উপার্জন থেকে সে ওদের খাওয়ার খরচ জোগাতো। তার সন্তানসম মহেশকে সে ঠিক করে খেতে দিতে পারেনি। সেই দুঃখ সে কোনোদিন ভুলতে পারেনি। মনে মনে রোজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করত সে। শতকোটিবার সে আল্লার কাছে

ক্ষমা চাইত তার পূর্ব জীবনের কথা ভেবে। সাক্ষী থাকত তার গো-পাল আর চোখের জল।

প্রথমদিকে জাফর ভাই আর অন্যান্য দোকানদারেরা কিছু মনে করত না। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, গো-পালেরা দিনে রাতে আসা শুরু করাতে, জাফর ভাইদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। অবশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে এল যে গফুরকে আর রাখা যাবে না।

চৈত্র মাসের সন্ধ্যেয়, গফুর আর আমিনা আবার সেই শিয়ালদহ স্টেশনে হাজির। আবার সেই ট্রাকের লাইন। কারো কাছে গফুর শুনেছিল গুরুগ্রাম বলে একটা কোথায় গ্রাম আছে, যেখানে মেলা বাগান বাড়ি আর নিত্য ভালো মালির প্রয়োজন।

তারা ভরা আকাশের এক চিলতে চাঁদ, পিচের রাস্তার বুক চিরে কলকাতাকে পেছনে রেখে ট্রাক ছুট দিল। ঘরছাড়া গফুর, আবার আমিনা আর মহেশকে নিয়ে পাড়ি দিল নিরুদ্দেশের পথে। ❑

পুনশ্চের আর্জিতে সবিনয় নিবেদন—শরৎবাবুর পাঠকসমাজ আমাকে ভুল বুঝবেন না...

ফেরিওয়ালা

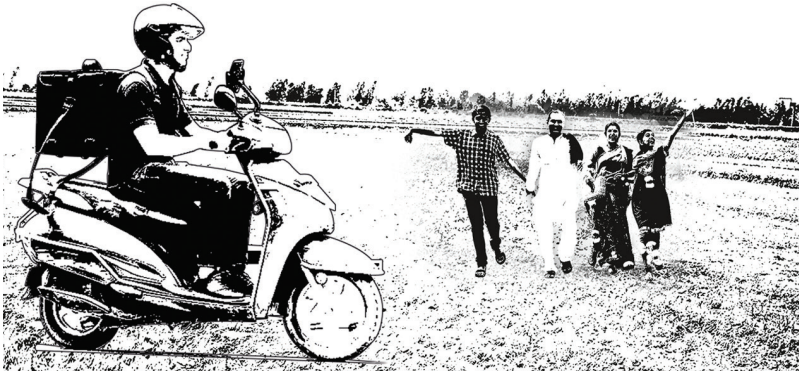

আর একটা সকাল। রোদের আলো যেন বিশুর চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুম থেকে তুলে দিল। রাত আর দিনের কোনো বিশেষ বিভেদ নেই। না আছে সপ্তাহর শুরু বা শেষ। তবে একটা কথা, মাঝে মাঝে রাত তাকে একটা দুটো স্বপ্ন উপহার দেয়।

স্বপ্নগুলোর খুঁট যেন তার সেই কঙ্কালীতলা গ্রামেরই সাথে বাঁধা। স্বপ্নের কথায় একটু পরে আসছি। আগে চলুন বিশুর গ্রামের বাড়িতে যাওয়া যাক। স্টেট বাস টার্মিনাস থেকে বেরিয়ে বিখ্যাত কঙ্কালী দেবীর মন্দির। পুরাণে আছে এখানে সতীর কোমরের অংশ এসে পড়েছিল। তাই, এটি একটা শাক্তপীঠ। সেই কালিবাড়ি ডান দিকে রেখে, কিছুদূর গেলেই বিশু ওরফে বিশ্বনাথ হাজরার বাড়ি।

তবে এর থেকেও বড় পরিচয় এই গ্রামের আছে। গ্রামখানি বিশ্বভারতীর থেকে খুব কাছে। বাঙালির চিরদিনের গর্ব রবিঠাকুরের কর্মক্ষেত্র হিসেবে।

কঙ্কালিতলা গ্রামটিকে জাপ্টে রেখেছে কোপাই নদী। আর অন্য দিকে সভ্যতাকে ভর করে ধীরে ধীরে গ্রাম হয়ে উঠেছে মফস্বল। এইখানেই হাজরা পরিবারের চার পুরুষের বাস। ওরা তিন ভাইবোন। দুই ভাই—বিশু আর তারক। আর সবচেয়ে ছোটো আর আদরের বোন ঝিনুক। ঝিনুক জন্মাবার

কিছুদিন পরেই বিশুর মা গিরিবালা দেবী মারা যান। তিনি অনেকদিনই ভুগছিলেন কি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে কেউ জানে না। জানার সামর্থ্য ছিল না। বিশুর বাবা সৌমেন হাজরা জেলা বিডিও অফিসের পিওনের কাজ করেন। কোনো রকমে সংসার চালানো ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে খরচ করার ধৃষ্টতা তার ছিল না। পাড়ার হরি কম্পাউন্ডারের দাগ দেওয়া লাল-নীল ওষুধ খেয়ে বহু বছর রোগ সারাবার চেষ্টা করা হলো। শরীর যখন খুবই খারাপ হল, বীরভূমের জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তারদের বেশি সময় দিতে হয়নি। তার আগেই গিরিবালা দেবী পরলোকের পথে পাড়ি দেন। তখন ঝিনুক ছয় বা সাত বছরের হবে। হাজরাবাবু আর দ্বিতীয় পক্ষের কথা ভাবেননি। ওরা চারজন মিলে দুঃখকে ভাগ করে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত নেয়।

বিশুর বয়স তখন আঠেরো আর তারকের চোদ্দ। গ্রামের স্কুলে ওরা দুজন পড়াশুনো করত। গিরিবালা দেবী চলে যাওয়ার পরে, সংসার চলত ঠিকই, তবে কোথায় যেন সুরটা কেটে গিয়েছিল। বড় ছেলে হওয়ার তাগিদে, ঘর বাড়ি দুটোই সামলাতে শুরু করল বিশু। হাত পুড়িয়ে রান্না করা শিখেও নিল। এই ধরনের ঘটনা বা দুর্ঘটনা অনেক সংসারেই আকছার ঘটে থাকে। যেখানে ছেলেমেয়েদের শৈশব, কৈশোর ঘটনার প্রবাহে দলা পাকিয়ে দুম করে যৌবনের দরজাতে গিয়ে আছড়ে পড়ে। মুহূর্তে তারা বড় হয়ে যায়।

এইখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। খুব তাড়াতাড়িই পড়াশুনোর রাশটা আলগা হতে থাকল বিশুর। সেই বছর ছিল বিশুর উচ্চমাধ্যমিক। গ্রামের স্কুলের মাস্টার করালিবাবু বারবার বিশুকে আশ্বস্ত করা সত্ত্বেও, বিশুর উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোনো হল না। আর এই অবস্থায় যখন বিদ্যা অর্জনের রথ একবার দুর্ঘটনার পাঁকে আটকে যায়, তখন সেই রথের চাকা পাঁক থেকে বার করা, মানুষ তো ছার, দেবতারও অসাধ্য হয়ে পড়ে।

বিশু কিন্তু তার ছোটো ভাইবোন, তারক আর ঝিনুকের পড়াশুনো বন্ধ হতে দেয়নি। সৌমেনবাবু পড়াশুনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। নিজে

কোনোরকমে পড়তে লিখতে পারতেন। আর স্ত্রীর দীর্ঘ সময়ের অসুস্থতা তাকে বিস্মৃত করে দিয়েছিল।

অভাবের সংসারে একটু আশার আলো নিয়ে এল পাশের বাড়ির রমেন কাকা। তার ছেলে নাকি দিল্লির ওদিকে বড় চাকরি করে। কি করে সেটা ঠিক জানা নেই। তবে সেখানে নাকি জোয়ান ছেলেদের খুব প্রয়োজন। রমেন কাকা সৌমেনবাবুকে বলল, 'এবার রাশ ছাড়ো সৌমেন, তোমার দিনও তো হয়ে এল। সামনের বছরে তো তোমারও রিটায়ারমেন্ট। এবার সংসারের হাল যদি ওরা না ধরে, তো তোমরা বেহাল হয়ে পড়বে।'

রাতের খাবার সময় সংক্ষেপে আলোচনা হল। যাওয়া উচিত কিনা। কথা হল কত তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত। কঙ্কালিতলা গ্রাম তার দু বাহু মেলে বিশুকে আটকানোর চেষ্টা করেছিল ঠিকই কিন্তু সক্ষম হয়নি। বিশাল সাদা মেঘে ঢাকা স্কুলের মাঠ, যেদিকে চোখ যায় কাশবন, সবচেয়ে বড় কথা, জোছনাতে ভেজা কোপাই নদীর ঝাউবন। ছেলেবেলা, তখন ঝিনুক হয়নি, গিরিবালা দেবী তখন সুস্থ, মা-বাবার হাত ধরে তারা কোপাই নদীর ধারে বেড়াতে আসত। তারাগুলো সন্ধ্যার প্রদীপ হয়ে জ্বলত। আর আকাশের শশী ঝরে পড়ত কোপাইয়ের জলে। মা গুনগুন করে গান ধরত। আর দুই ভাই মায়ের পায়ের চিহ্ন ধরে, জ্যোৎস্না কুড়োতে কুড়োতে পেছনে চলত। সে যেন একটা স্বপ্নময় জগৎ। মায়ের এত অসুস্থতা হওয়া সত্ত্বেও, বিশু, তারকের মায়ের সেই রূপটি স্মৃতির ক্যানভাসে থেকে গেছিল। অসুস্থ মায়ের ছবি, মনে জায়গা করতে পারেনি। চিতার আগুনেই তা হারিয়ে গিয়েছিল।

এরপর কিছুদিনের মধ্যেই নবীন মুদির কাছে কিছু টাকা ধার নিয়ে ট্রেনে চড়ে বসা। আর এক ছুটে দিল্লি-গুরগাঁও পৌঁছনো। রমেনবাবুর ছেলে রতন এখানকার কি বলে ই-কমার্স কোম্পানির ডেলিভারি বয়। অর্থাৎ এই যুগের ফেরিওয়ালা। জিনিস ফেরি করার কাজ। কাজটা অনেকটা এইরকম। খুব ভোরে ওদের শহরের প্রান্তে গোডাউনে জমা হতে হত। সেখান থেকে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেট ওদের দেওয়া হত। যেটা তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নির্দিষ্ট বাড়ি পৌঁছে

দিতে হতো। জায়গা ভাগ করা থাকত। একটা মস্ত ব্যাগ, তার মধ্যে যত প্যাকেট ভরা যায়। সেটা পিঠে বেঁধে একটা পুরনো বাইকে চড়ে দিতে হতো ছুট। বাইক রতন জোগাড় করে দিয়েছিল। ভাগ্যিস গ্রামে থাকতেই লাইসেন্সটা করা ছিল। তারপর শুরু হতো ঘোড়দৌড়।

কত তাড়াতাড়ি কত প্যাকেট পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে সেটাই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য। শুরুতে মস্ত ব্যাগ নিয়ে কোনোরকমে রাস্তাতে বাইক চালানো। তবে প্রয়োজনের তাগিদে, সেটাও শিখে নিল সে। কায়দা হচ্ছে বড় বড় মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং ধরা। ওই উঁচু বাড়িগুলোতে আকাশের কাছাকাছি যারা থাকেন তাদের অঢেল পয়সা। সবসময় ফোন টিপে তারা জিনিস অর্ডার দিচ্ছেন। আর সেই জিনিস আলাদিনের জিনের মতো বিশু পৌঁছে দিচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। আরব্য রজনীর আলাদিনের প্রদীপের মতো এখানে কোনো শর্ত নেই। এখানে আলাদীনের প্রদীপ নতুন রূপে হয়েছে ফোন, যা দিয়ে যত ইচ্ছা জিনিস কেনার অনুমতি পাওয়া যায়, সে জিনিস কারু লাগুক বা না লাগুক। ই-কমার্স সাইটগুলি 'জি-হুজুর' হয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে থাকে সেই আজ্ঞা পালন করার জন্যে। আর বিশুরা হচ্ছে সেই নতুন যুগের ফেরিওয়ালা, যারা পৌঁছে দিচ্ছে সেই হরেক রকমের জিনিস সেই আকাশের কাছাকাছি থাকা মানুষদের।

বেশির ভাগ সময় সেই আকাশ-মানুষদের দেখা পাওয়া যেত না। ফোনে তাদের সাথে কথা হত। সেই স্বরে থাকে ভাবের অভাব। প্রথম প্রথম ভাঙা হিন্দি-ইংরেজি মেশানো গলায় উৎফুল্ল হয়ে বিশু বলত যে সে প্যাকেট নিয়ে এসেছে। ওপর থেকে উত্তর আসত, 'আচ্ছা, গার্ডের কাছে রেখে দাও।' অনেক সময় সেই স্বর প্যাকেটের আগমন অস্বীকার করত। কারণ তারা ভুলে গেছেন। তারপর ফোনে হয়ত দেখে তাদের মনে পড়ত তারপর তারা গ্রহণ করতে রাজি হত।

সে এক অদ্ভূত অভিজ্ঞতা। ছোটবেলাতে বছরে একটা প্যাকেটও বিশু পেয়েছে কিনা মনে নেই। তাই প্রথম প্রথম নতুন প্যাকেট কাউকে দিয়ে তার

আনন্দের হাসিটা দেখার খুব কৌতূহল হতো। কিন্তু বহু মাস জিনিস ফেরি করার পরও সে হাসির আর দেখা মিলল না। যারা এক-দুজন প্যাকেট হাতে নিত, তারা চোখ তুলে তাকাতোও না। যন্ত্রের মতো প্যাকেট নিয়ে মিলিয়ে যেত। এদের মধ্যে কিছু জন আবার প্যাকেট নিয়ে পরের দিন ফেরত দিয়ে দিত। হয়ত জীবনের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে একটা ব্যবধান থাকে, ওই প্যাকেট ফেরত দেওয়া ছিল তারই অভিব্যক্তি। প্রথম প্রথম অবাক হলেও, পরে এইসব গা-সওয়া হয়ে গেছিল।

জিনিস দিতে গিয়ে আরও অন্যরকমের ফেরিওয়ালার সাথেও আলাপ হতো। আসিফ শেখ দিত খাবার। ওর ঝোলা বড় ছিল না। কিন্তু ওকে বার বার আসা যাওয়া করতে হতো। ওই আকাশ-বাড়িগুলোর সামনে দোমড়ানো কয়েকটি বাইক সব সময় থাকত। ফেরিওয়ালারা সেই গগনচুম্বি মানুষদের চাহিদার জিনিস, খাবার উদয়-অস্ত সরবরাহ করে চলত।

এরই নাম বোধহয় সভ্যতা। যেখানে কোনো সময়ের রাশ নেই। যখন ইচ্ছে যে কেউ যে কোনো জিনিসের আকাঙ্খা করতে পারে। আর এই বিশুর মতো ফেরিওয়ালারা সদা উদগ্রীব তা পূরণ করার জন্যে। যত জিনিসের ফেরি হয় তত বাড়ে ওই কোম্পানির দাম বা মুনাফা। এই ফেরিওয়ালারা অবশ্য তার কোনো ভাগই পায় না। তাদের হিসেব মাপ করা। যত জিনিস ততটুকুই পয়সা। রোদ-জল-ঝড় জিনিস ফেরি করে চলা। এর কোনো বিরাম নেই। সেই আকাশ ছোঁওয়া বাড়িগুলি সর্বগ্রাসী খিদে নিয়ে হাঁ করে সব সময় দাঁড়িয়ে থাকত।

কাগজে বহুবার বিশু বিজ্ঞাপনও দেখেছে। তাদের মতো ফেরিওয়ালারা সুন্দর কাপড় পরে জিনিস ফেরি করছে। আর ওই আকাশ মানুষরা হাসিমুখে তা গ্রহণ করছে। বাস্তবে সেটা কোনোদিনই হয়নি।

এই আকাশ-মানুষেরা কিই বা খুঁজে বেড়াচ্ছে যে এত কেনার পরেও তাদের আশ মেটে না, এটা বিশু ঠাহর করতে পারত না। ও মাঝে মাঝে ভাবত, এই

আকাশ-মানুষদের ঘরগুলো নিশ্চয়ই খুব বড়, যে এত হরেক রকমের জিনিস সেই ঘরে অনায়াসে ঢুকে যায়।

এইখানে বন্ধু বলতে সেই আসিফ, জাফর আর মধু। ওদের বাড়ি নদীয়াতে। ওরা এক সাথে থাকত। মাঝে মাঝে আসিফ শস্তায় কিছু ভালো খাবার জোগাড় করত। সেই খাবার খেয়ে ফোনে ওরা সিনেমা দেখে কখন ঘুমিয়ে পড়ত জানে না।

আর সেইখানেই ভিড় করে আসে স্বপ্ন। গ্রামের বাড়ি। মায়ের চুড়ির আওয়াজ। তারক আর ঝিনুক খেলে বেড়াচ্ছে উঠোনে। বাবা ছাদের টালি ঠিক করছে। উঠোনে শিউলি ফুল ছড়িয়ে আছে। সবাই খুব খুশি। কি কারণ তা বোঝা যাচ্ছে না।

আবার কোনোদিন দেখে ওরা সবাই কোপাই নদীর তীরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। দূরে মায়ের ছায়া। আবার সেই গুনগুন মায়ের গান। ওরা সেই তালে মাকে ধরবার চেষ্টা করছে।

সব স্বপ্নেই ওরা সবাই থাকে। মাও থাকে কিন্তু মাকে দেখা যায় না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মনটা ভালো লাগে। বাবা, ভাই-বোনদের সাথে কথা বলে নেয়। তারক তাড়াতাড়ি ডানা মেলে চলে আসতে চায় ওর কাছে। ঝিনুক নাচ শিখতে শহরের বড় স্কুলে যেতে চায়। বাবা চুপচাপই থাকে। শুধু বলে 'ভালো থাকিস'। বাবার নীরবতা বিশুকে অনেক কথা বলে দেয়।

নিজের জন্যে যথাসামান্য খরচা রেখে বাকি পুরো টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দিত। আসিফ বুদ্ধি দিত, 'কিছু রেখে দে নিজের কাছে, ভাই-বোন-কেউ দেখবে না।' ও আসিফের কথা শুনে হাসত। হয়তো আসিফ ঠিক কিন্তু ওর ধারণা ওর সুপ্ত আকাঙ্খা, যে টাকা থেকে ওর পরিবারকে বঞ্চিত করলে, স্বপ্নগুলো আর ওর থাকবে না। মাকে আর ও দেখতে পাবে না। এই কথা ও সাহস করে আসিফকে কোনোদিন বলেনি বা হয়ত বলতেও পারবে না।

আজ বিশু দুই শিফ্‌টে কাজ করছে। বাড়িতে টাকা প্রয়োজন। সন্ধ্যাতারা অনেকক্ষণই ওই আকাশবাড়ি ছুঁয়ে এগিয়ে গেছে। আসতে আসতে রাত নেমে

আসছে। রাস্তায় বড় একটা লোকজন নেই। চাঁদের আলো পড়ে রাস্তা চিক চিক করছে। যেন সেই কঙ্কালিতলার কোপাই নদীর কালো জলের মত।

বিশু, মধু, জাফর, আসিফ এরা দৌড়ে চলেছে তাদের পসার নিয়ে ওই আকাশবাড়ির দিকে। আজকের সভ্যতার ওরাই চাকা। বেঁকে যাওয়া পিঠ, ঘর্মাক্ত কলবরে ওদের ওপর দাঁড়িয়ে এই ঝকমকে পৃথিবী।

সময়টা হয়ত পাল্টেছে। ওদের কাজ, ওদের দায়িত্ব একই রয়ে গেছে। ইতিহাস ওদের মর্যাদা সেরকম দেয়নি। হয়ত দেবেও না। কিন্তু ওরা সব উপেক্ষা করে জীবনের জয়গান গেয়ে, নিজেদের ক্ষয় করে আকাশ-মানুষদের নিয়ে এগিয়ে চলেছে নতুনের দিকে। ❑

রাজ আর শ্রী

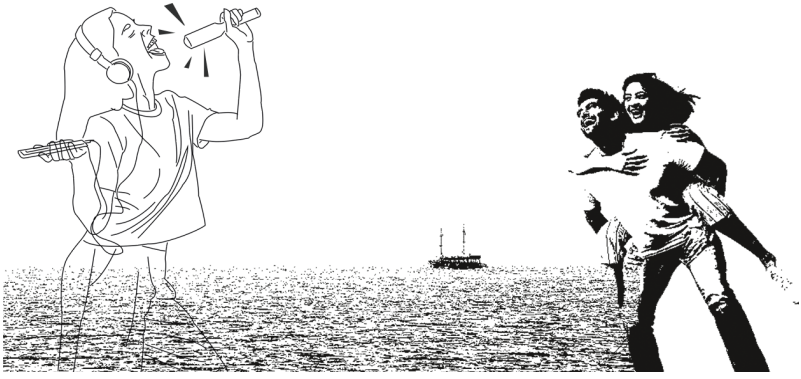

শ্রী : কেমন আছিস রাজু, চেনা যাচ্ছে!!

রাজ : হু ইজ ইট?

শ্রী : আরে আমি শ্রীকান্ত। ওই নামে আর তোকে কেই বা ডাকে। নাকি ইজ দেয়ার সামওয়ান?

রাজ : হাউ ডিড ইউ গেট মাই নাম্বার?

শ্রী : সেদিন পার্ক স্ট্রীট র‍্যাফসডি নাইটক্লাবে গিয়েছিলাম অ্যান্ড স' ইউ ইন ইয়োর ডিজে সেল্ফ। গট ইয়োর নাম্বার ফ্রম দ্য ম্যানেজার। অনেকগুলো মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল। যাক সে কথা। ইউ হ্যাভ চেঞ্জড সো মাচ। চেঞ্জড ফর দ্য গুড অফকোর্স।

রাজ : ইউ অ্যান্ড র‍্যাফসডি! তোর হলো কি! অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখছি! আর আমাকে এত তেল তো কোনোদিন দিতি না। সাডেনলি হোয়াই টুডে!

শ্রী : না রে...ইউ লুকড এ লট ডিফারেন্ট। লট মোর কনফিডেন্ট। এ ভেরি প্লেজেন্ট চেঞ্জ।

রাজ : প্লেজেন্ট কিনা জানি না। সময় চাবুক মেরে শিখিয়ে দিয়েছে। কলেজের পর তুই তো হঠাৎ ভ্যানিস হয়ে গেলি। নো পাত্তা। অফ্ দ্য গ্রিড।

ফ্যামিলিতে চাপ। আইদার বিয়ে করো অর ডু সামথিং। পড়াশুনো বুঝলাম আর হবে না। তাই এই গান-বাজনা যেটুকু জানতাম সম্বল করে বেরিয়ে পড়লাম। অ্যান্ড...

শ্রী : আমি জানি, আমি ঠিক করিনি। তবে এই অন্যায় করা সত্ত্বেও মনে হয়েছিল ইউ উইল ফরগিভ মী। কার ভরসায় আই ডোন্ট নো।

রাজ : বাহ্, এটা বলে ইউ আর ট্রাইং টু মেক এ ফেয়ার ডীল। জাস্ট ডোন্ট ইভেন থিঙ্ক অফ ইট। সামনে থাকলে তোর সব দাঁত আমি ভেঙে দিতাম। থ্যাংক ইয়োর স্টারস্ ইউ আর নট হেয়ার। অ্যান্ড হোয়াই ডু ইউ থিংক আই উইল টক টু ইউ। আফটার হোয়াট হ্যাপেন্ড?

শ্রী : ওকে, তাহলে থাক আর কিছু বলব না।

রাজ : আবার রাগ দেখাচ্ছে। রাগটা দেখছি ষোল আনা আছে। সেম অ্যাজ কলেজ ডেজ। ইউ ডোন্ট সীম টু হ্যাভ চেঞ্জড অ্যাট অল। এক্ষুনি আমাকে তোর সবচেয়ে সুন্দর একটা ফটো পাঠা। জাস্ট নাউ।

শ্রী : তাহলে তো সব সাসপেন্স শেষ হয়ে যাবে। এই আধো আলো আধো ছায়া ভালো লাগছে না? থিংক অফ ইট দিস ওয়ে, উই কলড্ ইচ আদার ইন দ্য ডার্ক। অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ আ ফ্যামিলিয়ার ইকো। ইট হ্যাজ মেড বোথ অফ আস এক্সাইটেড। ওয়েল, অ্যাটলিস্ট মী এক্সাইটেড। আস্তে আস্তে অজানার পর্দাটা সরালে ভালো লাগবে কি বলিস?

রাজ : শোন, তোর হেড আই উইন টেল ইউ লস ডীল, আমার ভালো লাগে না। কোনোদিনই লাগেনি। অ্যান্ড ইউ আর ডুইং এক্সাক্টলি দ্য সেম। কলেজে পড়ার সময়, দশ মিনিটে আমার নোটগুলো নিয়ে নিতিস। অ্যান্ড হোয়েন আই আস্কড ফর ইয়োরস, সারাদিন ঘোরাতি। নচ্ছার ছেলে। সেদিন নাইট ক্লাবে দেখেও, ইচ্ছা করে না দেখা করে চলে গেলি যাতে আবার আমাকে জ্বালাবি। আমাকে আর কত স্ট্রেস দিবি!!

শ্রী : আজকের লিভিং ইন দ্য মোমেন্টের পৃথিবীতে আমি খাপ খাওয়াতে পারিনি রাজু। আমার সময় এখনো ওই কলেজের দিনের মতো মন্থর

গতিতে চলছে। এক মুহূর্তে কন্ট্যাক্ট। পরের মুহূর্তে ছবি। তারপর ভিডিও কল। ব্যাস সব শেষ। এই যে একটা উপলব্ধি, এটা এখানে আমায় নেশা ধরায়। তুই তো আমায় জানিস।

রাজ : সে আর বলতে। যত ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সিনেমা তোর প্রিয়। তোকে একটা নতুন হিন্দি ছবি দেখাতে আমাদের, আমার কম কাটখড় পোড়াতে হতো? বাপ রে বাপ। সেখানেও, তোর পাল্লায় পড়ে তোর সিনেমা দেখতাম। আর যখন আমার পালা আসত, তোর নাকি ভীষণ কাজ।

শ্রী : তবে এক সাথে কত নাটক দেখতাম, সেটা বল। মনে আছে ফারুক-শাবানার তুমহারি অমৃতা। তুই হাপুস নয়নে কেঁদেছিলি।

রাজ : তুইও তো কেঁদেছিলি।

শ্রী : হ্যাঁ, তোকে দেখে কান্নাই পাচ্ছিল। কি আর করব। তারপর মনে আছে, বাস পাইনি। হেঁটে বাড়ি ফেরা। পুরো কলেজ স্ট্রীট থেকে শ্যামবাজার। মাসিমা মারতে বাকি রেখেছিলেন।

রাজ : মা তো ওইটুকুই। তোকে খুব স্নেহ করত। মায়ের একটাই স্ট্রেস ছিল। তুই ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলি কিনা। তোর ব্যবহার, মেলামেশা একেবারেই... যাক গে।

শ্রী : মাসিমা কেমন আছেন?

রাজ : সে পাট চুকে গেছে। মা আর নেই। আমি তোর মতো একা।

শ্রী : ওএমজি! কবে ঘটলো!

রাজ : এই বছর দুয়েক আগে। সেরিব্রাল স্ট্রোক। কিছু করা গেল না। আমি আউট স্টেশন ছিলাম। এসে আর দেখতে পাইনি। যাক, মা বেঁচে গেছে। এই রোজ মেয়ের টেনশন আর নিতে হয়নি।

শ্রী : সেই ডালপুরি। সেই ছানার পায়েস। আর কেউ যত্ন করে খাওয়াবে না...

রাজ : ডু ইউ রিয়েলাইজ ওয়ান থিং? এভরিথিং ফর ইউ ইজ বেসড অন

হোয়াট ইউ ফেল্ট গুড অ্যাবাউট। একবারও জিজ্ঞেস করলি না, হাউ অ্যাম আই ডুইং? আমাকে কিরকম ইমপ্যাক্ট করলো। তোর ডালপুরি, তোর ছানার পায়েস। হোয়াই অ্যাম আই স্টিল টকিং টু দিস সেলফিশ মনস্টার। সামনে থাকলে...

শ্রী : আহা তুই রাগছিস কেন। পৃথিবীর উপলব্ধি মানুষ তো নিজের মন দিয়েই করে তাই না। এখন আমার যদি ওই ডালপুরি আর ছানার পায়েসের কথা প্রথম মনে হয়, আর তোকে সত্যি কথা বলি, সেটা কি অন্যায় করা হলো। তোর আমার সম্পর্কের ইউএসপি তো চিরকালই অনেস্টি আর ক্ল্যারিটি দিয়ে বাঁধা ছিল বা আছে তাই না?

রাজ : অনেস্টি, আই এগ্রি। ক্ল্যারিটি, বলতে পারব না। তুই কোনোদিন আমাকে প্রোপোজ করিসনি। কিন্তু তোর কোনো ব্যবহারে আমার মনেও হয়নি ইউ বিলিভ্ড ইন প্রোপোজিং। তারপর কলেজের বছরগুলো, তুই না থাকলে আমি পাশ করতে পারতাম না। ইউ য়্যার অলওয়েজ দেয়ার। সেই তুই হঠাৎ একদিনের নোটিশে হারিয়ে যাবি...

শ্রী : রাজু...অন্য কথা বলি।

রাজ : দেখেছিস, ইউ নেভার ইভেন অ্যালাও দ্য ফীলিং টু সেটল্! বদমাইশ ছেলে কোথাকার। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক টু ইউ ইফ ইউ ডোন্ট গিভ মী অ্যান অ্যানসার টু দ্য টাইম সিন্স ইউ সাডেনলি লেফ্ট।

শ্রী : আজকেই?

রাজ : এক্ষুনি। অর আই অ্যাম ডান উইথ ইউ!! অ্যাটলিস্ট ইউ ও' মী দিস।

শ্রী : সেটা ভুল, আই ও' ইউ মাচ মোর। পসিবলি অল দ্যাট আই অ্যাম টুডে। পরিবার বলতে তো তোরাই—তুই, কাকিমা, ইদ্রিস, জেমস আর আভা। তোর আভাকে মনে আছে?

রাজ : মনে আবার নেই? তুই তো কলেজের ক্যাসানোভা ছিলি। শুধু কি আভা? দেয়ার য়্যার সো মেনি। গা জ্বালিয়ে দিতি হতচ্ছাড়া ছেলে!! নাউ কাম ব্যাক টু ইয়োর স্টোরি।

শ্রী : উফ্। তুই যে কী! এখনো সেই বাঘিনীর মতো অ্যাটিচুড।

রাজ : তোকে চাপে না রাখলে, তোকে থোড়াই বাঁধা যেত। অবশ্য বাঁধতে আর পারলাম কই...

শ্রী : মাঝে মাঝে গায়েব হয়ে যেতাম মনে আছে। তুই জিজ্ঞাসা করতি। আমি বলতাম গেছিলাম প্রকৃতির কাছে বুদ্ধির গোড়ায় দম দিতে। আসলে শহরের একঘেয়ে জীবন একটুতেই হাঁফিয়ে পড়তাম।

রাজ : তা আর মনে নেই? তারপর হঠাৎ একদিন উদয় হতিস। আর আমাকে খাওয়াতে নিয়ে যেতিস নোটের জন্যে। সুবিধাবাদী কোথাকার।

শ্রী : এই ভাবেই একবার ইদ্রিস বলল ওর বাড়িতে গিয়ে ক'দিন থাকতে। ভাবলাম মন্দ হয় না। গেলাম খিদিরপুরে। ওর বাবা সফিক শেখ মাটির মানুষ। উনি একটি মালয়েশিয়ান জাহাজে খালাসিদের ম্যানেজার ছিলেন। আমাকে নানা দেশের গল্প বলতেন। হাঁ করে শুনতাম। আমার আগ্রহ দেখে বললেন, 'তুমি এই কাজ করবে?' কিছু না ভেবেই 'হ্যাঁ' করে দিলাম। দুর্গম সমুদ্র, বিপুল জলরাশি, সম্পূর্ণ অচেনা দেশে পাড়ি দেওয়া...আর ভাবতে পারছিলাম না।

রাজ : আচ্ছা, এ তো তুই আমাকে কক্ষনো বলিসনি জানোয়ার ছেলে!

শ্রী : বলার সাহস হয়নি। যদি তুই বাধা দিস। আর অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি না দিতে পারি। তারপর কলেজের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই, কাগজ পত্র তৈরি হয়ে গেল। জেমসের কাকা পাসপোর্ট অফিসে ছিলেন। খুব বেগ পেতে হয়নি। পরীক্ষাও শেষ আর আমারও মন উড়ু উড়ু। তোর মনে আছে শেষ বারের দেখা।

রাজ : মনে আবার নেই? সল্টলেক ফুট ব্রিজের পাশে, কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। তুই এলি। যেন কিছুই হয়নি। আমরা অনেকক্ষণ হাঁটলাম। ঘনাদার দোকানে চা খেলাম। তুই বলেছিলি ঝাঁপ দেব ভাবছি। আমার অবুঝ মন, ভাবলাম প্রোপোজ করবি বোধহয়।

তারপর ব্যাস। তুই হাওয়া। ভাবলাম, হয়তো আবার দম নিতে গেছিস। সে গুড়ে বালি, ইদ্রিস এসে চিঠি দিল, ইউ আর গ'ন!

শ্রী : ও কিছু বলেছিল?

রাজ : বলতে পারব না। মনে নেই। তোর চিঠি পড়ার পর আমি সাত দিন বাড়ি থেকে বেরোতে পারিনি। কতো লক্ষ বার তোকে গালাগালি দিয়েছি, তুই যদি জানতি।

শ্রী : যাক, মনে ধরেছিলাম বল! তোর গালাগালি আমার ভালোবাসার বর্ম হয়ে আমাকে রক্ষা করেছে এতদিন।

রাজ : এইসব বলে চাল ভিজবে না। অনেক এইরকম ভারি ভারি কথা তুই বলতে পারিস আমি তা জানি। মূল গল্পে এসো রাসকেল। যদি পাশে থাকতি খিমচে তোকে ক্ষতবিক্ষত করে দিতাম, শয়তান!

শ্রী : তারপর আর কি। ভেসে পড়লাম পরদিন সকালে। আমার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল জাহাজ হর্ষবর্ধন। আন্দামান, পোর্ট ব্লেয়ার। উফ্! কী দারুণ অভিজ্ঞতা তোকে কি বলব। গঙ্গাতে নৌকা চড়েছি। কিন্তু গঙ্গা বক্ষে অত বড় জাহাজ চড়ে যাওয়া! গঙ্গার দুই ধার জাহাজ থেকে দেখা। গঙ্গা সাগর ক্রস করা। উন্মুক্ত ভারত মহাসাগরে জলের ওঠানামা। ঠিক যেন প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে আছে আর আমাদের জাহাজটা নিয়ে খেলছে! তারপর আন্দামান! সেই সেলুলার জেল! রস আইল্যান্ড! নিকোবর...উফ্, তুই ভাবতে পারবি না!

রাজ : তা জানিয়ে গেলে কি তোর খারাপ হত হতভাগা ছেলে!

শ্রী : আন্দামান থেকে ঘুরে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল! আমার ভেতর থেকে কেউ যেন বলল, আর থেমে থাকিস না! এই বিশ্ব বসুন্ধরাতে বেরিয়ে পড়! কত মানুষজন প্রকৃতির সম্ভারের সংস্পর্শে আসবি, কত কিছু শিখবি, জানবি, উপলব্ধি করবি! ফিরে একদিনের মধ্যেই অন্য জাহাজ ধরে মালয়েশিয়ার পথে পাড়ি দিলাম।

রাজ : দারুণ। এই নাহলে তুই বন্ধু। আর আমি তখন নিজেকে সামলে, মায়ের সাথে ঝগড়া করে গান-বাজনা চালু করব ভাবছি।

শ্রী : লাঙ্কাভি পরের ডেস্টিনেশন। এত সুন্দর জায়গা মুখে বর্ণনা করা যাবে না। সমুদ্র এখানে নীল আর সবুজ। আর ছোটো ছোট দ্বীপগুলো গাঢ় ঘন সবুজের চাদরে মোড়া। শুধু তাকিয়ে থাকলেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

রাজ : আচ্ছা, তুই যে এত কথা বলছিস, তোর কাজটা কি জাহাজে সেটা তো বলছিস না।

শ্রী : সরি, কাজটা নাকি এত বোরিং যে কেউ করতে চাইত না। জাহাজে অফিসার বাদ দিয়ে যারা রেগুলার স্টাফ ছিল, অর্থাৎ খালাসি, তাদের ওপর নজরদারি করা। ঠিক ডিউটি করছে কিনা। সবাই সুস্থ আছে কিনা। এইসব দেখা। আট ঘণ্টার ডিউটি হতো। তারপর আর একজন আমার জায়গাতে আসত...এইভাবেই।

রাজ : বাহ্, অবশ্য তুই তো জন্মেই ম্যানেজার। যেভাবে আমাকে, বন্ধুদের ম্যানেজ করতি নিজের স্বার্থের জন্যে, সেটা আমার বা আমাদের থেকে ভালো কে জানে...তারপর?

শ্রী : তার আর পর নেই। এই কাজ কেউ বেশিদিন করত না। আমি দেখলাম এর থেকে ভালো কাজ আমি পাবো না। সবচেয়ে খারাপ শিফ্ট অর্থাৎ রাত্রিবেলা আমি নিতাম। বেশির ভাগ সময় খালাসিদের সাথে আপোষ করে নিতাম। ওদের আমি স্পেস দেবো ওরাও আমায় স্পেস দেবে। একটা জিনিস দেখতাম, লোক তোর ইনটেনশন খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে। ওরা বুঝতে পেরেছিল, আমি ভালই আছি। আমার উন্নতি করার অর্থাৎ বেশি কাজ দেখিয়ে প্রশংসা কুড়োবার কোনো প্রবৃত্তি নেই, তাই ওরাও আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাতো না।

রাজ : আর কোথায় কোথায় গেলি...

শ্রী : ওখান থেকে জর্ডন। সেখানে পেত্রা দেখতে গেলাম। আবার সেই

রোমাঞ্চকর অনুভূতি। এও কি সম্ভব? তারপর কত জায়গাতে গেছি মনে নেই। নর্দার্ন লাইটস্ দেখেছি ফিনল্যান্ড গিয়ে। আকাশে দেবতাদের রং নিয়ে খেলা। পেরুতে গিয়ে মাছু পিচ্ছু। ঘুমন্ত নগরী, যেন হঠাৎ একদিন জেগে যাবে। আমি কোথাও গেলে, শেষ কপর্দক দিয়ে যত সম্ভব ঘুরে নিতাম। কে জানে, আবার আসতে পারব কিনা।

রাজ : তা তুই পারিস, পয়সাকড়ির ব্যাপারে তুই চিরটাকাল ক্যাবলা ছিলি।

শ্রী : আর একটা উপলব্ধি হল জানিস। আমরা এই মোবাইল ফোনের যুগে ভীষণ একা। একবার স্পেনে গিয়ে রেইনা সোফিয়া বাইরে বেরিয়ে জাস্ট বসেছি। তার কিছুক্ষণ আগে পিকাসোর ভয়ঙ্কর গুয়ের্নিকা আকণ্ঠ পান করেছি। বসে বসে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি। পাশে এক অল্প বয়সের ভদ্রমহিলা বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর হঠাৎ আমার সাথে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করে দিল। আমি কিছু বুঝতে না পেরে, ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে কথা বলতে লাগলাম। কত সময় কেটে গেল কে জানে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে 'গ্র্যাসিয়াস' বলে ভিড়ে মিলিয়ে গেল। শী ওয়াজ ওয়ান্টিং টু টক টু সামওয়ান বাট দেয়ার ওয়াজ নান।

রাজ : আই ডোন্ট বিলিভ ইউ। তুই মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে খুবই ভাল পারিস। কলেজের সোশ্যালে তোর ন্যাকামো আমি দেখেছি। আভা আর তোর কর্ণ-কুন্তি সংবাদ রিহার্সাল। কত বার প্র্যাকটিস। ইচ্ছে করে আমার সাথে একটা গানও করলি না। উফ্, কেনো আমি যে কথা বলছি!

শ্রী : মাই গড, ইউ হ্যাভ রিমেমবারড্ অল অফ ইট। গল্পে ফেরা যাক। এইভাবে বহু বছর কেটে গেল। আমি আর দেশমুখো হইনি। হঠাৎ বাগদাদ থেকে একটা জাহাজ তেল নিয়ে ভারতে আসবে। ভাবলাম চলো দেশ দর্শন করে আসি। এসে ইদ্রিসের বাড়িতে উঠলাম। ওর

কাছেই জানলাম তোর কথা। তারপর ইদ্রিস নিয়ে এলো ইন র‍্যাফসডি।

রাজ : তাও আমার কাছে এলি না। তুই কি নিষ্ঠুর! হোয়াই আই অ্যাম নট কিলিং ইউ। তুই এক্ষুনি আমার কাছে আয়। আমার মার না খেলে তোর প্রায়শ্চিত্ত হবে না। আমারও শান্তি হবে না। এক্ষুনি আয়। অ্যাড্রেস বল, আমি উবের পাঠিয়ে দিচ্ছি। ডোন্ট গিভ মী এনি এক্সিকিউজ।

শ্রী : এখানে তো উবের আসে না রাজু। আমি তো আবার জাহাজে যে! এবার ভ্লাদিভস্তকের পথে। যে জাহাজে আছি, এই কন্ট্র্যাক্ট বহু মাস আগে নেওয়া। আর তা ভাঙলে খুব বদনাম হয়। অন্য চাকরি পেতে অসুবিধা হয়।

রাজ : ওঃ নো! তুই আবার আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলি! কেন তুই আমাকে এত কষ্ট দিস শ্রীকান্ত...হোয়াই??

শ্রী : সব সম্পর্ক একই রকম হবে 'অ্যান্ড দে লিভ্ড হ্যাপিলি এভার আফটার', এটা হয় না রাজু। তুই আর আমি একই গাছের ফুল। কিন্তু আমরা ভিন্ন ডালে ফুটি। কাছে অথচ কাছে নেই। তুই খেয়াল করেছিস কিনা জানি না। আকাশে যখন বাঁকা চাঁদ ওঠে, তার পাশে দেখবি সন্ধ্যা তারা দেখা যায়। ওরা সব সময় আকাশে পাশাপাশি থাকে। খুব কাছে অথচ আলাদা। তোর আমার সম্পর্কটা তাই।

রাজ : অত তারা ফারা আমি জানি না। বুঝি না। তুই কেন আমাকে যোগাযোগ করলি! আমি তোর অ্যাবসেন্স অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছিলাম!

শ্রী : জানি না। যদি কষ্ট দিয়ে থাকি, ক্ষমা করে দিস। তবে তোকে আমি আমার জীবন থেকে সরাতে পারিনি। যেখানেই গেছি। তোর ভালবাসা অনুভব করেছি। সব জায়গা তুই ছড়িয়ে ছিলি। তোর থেকে আপাতদৃষ্টিতে দূরে থেকে এটা বুঝেছি তোকে ছাড়া আমি অচল। তাই এবার কলকাতা ফিরে একটা কিছু করতে হবে। হয়ত আর একটা ঝাঁপ মারতে হবে।

রাজ : সত্যি, কথা দিচ্ছিস তাহলে?

শ্রী : কথা দিলাম না। মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করলাম। দেখা যাক। এবার তুই ঘুমোতে যা। আমিও একটু শুই।

রাজ : ওকে, ফটো পাঠা।

শ্রী : নাহ্, সশরীরে দেখা হবে।

শ্রী : শঙ্খ ঘোষের বিখ্যাত কবিতা মনে আসছে। ওটা দিয়ে তোকে ঘুম পাড়িয়ে দি—

"সবসময়ই কি ভালো বলবে লোকে
মন্দ কথাও শুনতে হবে কিছু
তাই বলে কি ভেঙে পড়বে শোকে
তাতেই এমন মাথা করবে নীচু

এও প্রকৃতির জোয়ার ভাঁটার মতো
যাওয়া আসার ছন্দ মেনে চলে
রাত্রিবেলা বিরাট ছিল ক্ষত
ভোর ধুয়ে দেয় সবটা শিশির জলে

তোর মুখটিও যদি এমন কাতর
আমার জীবন শূন্য লাগে তবে
আয় তো দেখি অবিশ্বাসের পাথর
সরিয়ে দুজন বাঁচি সগৌরবে।"

গুডনাইট!! ❑

অহরিমান

ডাক্তার অহরিমান সেন। বারাসাত টাউনে চাঁপাডালির মোড়ে এক্কেবারে স্টেট বাস টার্মিনাসের ঠিক উল্টোদিকে ওনার চেম্বার। এর থেকে ভালো জায়গা পুরো বারাসাতে পাওয়া ভার। পূর্বপুরুষের থেকে পাওয়া এই দোকানঘর। শোনা যায় বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে এটা একটা বড় মিষ্টির দোকান ছিল। ডাক্তারবাবুর বাবা অনীরবাবু বহু চেষ্টা করে যখন ওই মিষ্টির দোকান চালাতে পারলেন না, দোকানের ঝাঁপ আপনাআপনিই বন্ধ হয়ে গেল। সেই ঘটনার সাক্ষী কেউ একটা নেই। যারা কাজ করতেন, সময়ের তাড়নায় তারা অন্য জীবিকা ধারণ করে এদিক ওদিক ছিটকে গেছেন। শুধু রয়ে গেছে বটগাছের মতো পুরনো দারোয়ান দ্রুজ দাস।

আসলে ঘটনাটা অনেকটা এইরকম, অনীরবাবু অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কর্মচারীদের ঠিক মতো বেতন দিতেন না, উদয়াস্ত খাটাতেন, মিষ্টির দাম অন্য দোকানের তুলনায় বেশি চাইতেন। ভালো কথা কি খারাপ কথা যাইহোক না কেন, বিনা সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়াতেও জৈষ্ঠ্যের পাকা কাঁঠালের গন্ধের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে গেছিল। বাসযাত্রীরা পারতপক্ষে ওইখানে যেতেন না। যদি না তাদের খুব তাড়া থাকত। দোকানের বিক্রি কমে যাওয়াতে, দোকানের কর্মচারী কমাতে হলো। পার পেয়ে গেল দ্রুজ দাস।

সে বুঝেছিল খালি দারোয়ানগিরি করে চাকরি বজায় রাখা যাবে না। সন্ধ্যে নামলে, অনীরবাবুকে দেশি মদ এনে দেওয়া। গা-হাত-পা টিপে দেওয়া এবং সব রকমের খারাপ কাজে ওনাকে সাহায্য করে নিজেকে সেন পরিবারের এক অপরিহার্য সদস্য করে নিয়েছিল। দোকানের বা ব্যবসায়ের বদনাম হওয়াতে, সেন পরিবার সাহস করে আর নতুন কোন ব্যবসার উদ্যোগ নেননি। দোকানের ঝাঁপ তারপর থেকে বন্ধই ছিল।

কালে-দিনে বারাসাতে লোকজনের যাওয়া-আসা বাড়ে, দোকানঘর ভাড়া নেওয়ার জন্যে কিছু বিত্তবান ব্যবসায়ী আগ্রহ প্রকাশ করে। তাদের মধ্যে শ্যামবাজার-হাতিবাগানের সাহা জুয়েলারির মালিক রমেশ সাহা মোটা টাকা দিয়ে বায়না করে যান। সেন পরিবার ভাবলো বোধহয় সুখের দিন ফিরল। কিন্তু দোকানঘর উদ্বোধনের কিছুদিন আগেই রমেশবাবু হঠাৎ হৃদরোগে মারা যান। এই খবর চাওর হওয়ার পর, ওই দোকানকে সবাই 'শয়তানের কারখানা' হিসেবে আখ্যা দিতে শুরু করায়, আর কেউ কোনোদিন নিতে চায়নি।

এদিকে, কয়েক বছর হলো অনীরবাবুর একমাত্র ছেলে অহরিমান সেন ডাক্তারি পাশ করেছেন। কলকাতা নীলরতন সরকার হসপিটাল থেকে এমবিবিএস করে, জেনারেল মেডিসিনে স্নাতকোত্তর লাভ করে যখন বড় প্রাইভেট হসপিটালে জয়েন করতে যাবে, বাধ সাধলো অনীরবাবু। 'সেন বাড়ির ছেলে কারো হয়ে কাজ করে না। তারা কাজ করায়।' পুরনো ফিকে হয়ে যাওয়া বনেদি অহঙ্কার আর সেই ঘটনার সূত্র ধরেই ওই মিষ্টান্ন ভাণ্ডার হয়ে উঠল ডক্টর সেন'স ক্লিনিক।

অনেক আড়ম্বরের মধ্যে দিয়ে সেই দোকান ডাক্তারের চেম্বারে পরিণত করা হলো। আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন থেকে শুরু করে সব দৈনিক গ্যাজেটের ব্যবস্থা করা হলো। আপাতত সেগুলিকে ভাড়া নেওয়া হলো। এই কথা ভেবে, কালে-দিনে পসার বাড়লে তা কিনে নেওয়া হবে।

কম্পাউন্ডারের খোঁজ চলল। কিন্তু অনীরবাবুর বদনাম থাকাতে কেউ এসে ওই কাজ করতে রাজি হলো না। অগত্যা, দ্রুজকেই বুঝিয়ে শুনিয়ে কম্পাউন্ডার

করা হল। মাইনে কিছু বাড়িয়ে দেওয়াতে দ্রুজের সংশয় অনেকটা ভাঁটা পড়লো এইভাবেই শুরু হলো ডাক্তার অহরিমান সেনের প্র্যাকটিস।

দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা শীত আর গ্রীষ্ম চলে গেল। বর্ষার স্রোত এসে যত আবর্জনা, ধূলো পরিষ্কার করে গেলেও, অহরিমান ডাক্তারের চেম্বারে কোনো সাড়া জাগাতে পারলো না। কিছু রুগী আসা-যাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু বেশিরভাগই আশপাশের লোক। তাদের না আছে শরীরের প্রাণশক্তি আর না আছে পকেটের জোর। জ্বর, পেটখারাপ, বাত, ফোঁড়া ইত্যাদি এই সামান্য রোগ ব্যতীত ওই চেম্বারে কেউ আসত না। রাত দুপুরে কোনো প্রয়োজন হলে ডাক্তারবাবুর ডাক পড়ত, তাও লোকেরা হাসপাতালেই যাওয়া পছন্দ করত। এই স্বল্প রুগী দিয়ে তো আর অতবড় ডাক্তারের চেম্বার চালানো যায় না। মনমরা ডাক্তারবাবু। আরও মনমরা তার নতুন কম্পাউন্ডার। দ্রুজ জানতো যতই তাকে বেশি মাইনে দিয়ে রাখা হোক না কেন। যদি ছোট সাহেবের পসার না জমে তাহলে সেই দারোয়ানগিরি করেই জীবন চালাতে হবে। এদিকে অহরিমানের সহপাঠীরা নানা বড় হাসপাতালে যোগ দিয়ে তরতর করে উন্নতি করতে লাগল। একে তো মোটা মাইনে। তারপর রুগীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তাদের হাসপাতাল থেকে বার করে নিজের বাড়ির চেম্বারে নিয়ে আসা। সে এক এলাহী ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাথে আড্ডা হতো। এবং অনেক রাতে এক রাশ বিরক্তি আর যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি ফেরা। রোজই ভাবতেন এর একটা হেস্তনেস্ত করবেন। কিন্তু সকালে উঠে সেই মনের জোর কর্পূরের মতো উবে যেত। আবার ক্ষীণ আশায় ভর করে তিনি চেম্বারে চলে আসতেন।

এইরকমই একদিন গ্রীষ্মের সন্ধ্যে। সূর্যদেব তার ঘরে ফিরেছেন কিছুক্ষণ। কিন্তু তার প্রভাবে এখনো চারিদিক জ্বলছে। রাস্তাঘাটে বিশেষ মানুষের আনাগোনা নেই। ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ হলো চেম্বারে এসে বসেছেন। হঠাৎ চেম্বারের বাইরে এক ভারী গলা। 'আসতে পারি'? ডাক্তারবাবু এই গলা আগে কোনোদিন শোনেননি। কিন্তু তাও তার মনে হলো যেন এই গলা তার খুব চেনা, পরিচিত। গলার আওয়াজ যেন তার নিজেরই আওয়াজ। এই আওয়াজে তিনি

যেন নিজের সাথে কথা বলেন। আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে দ্রুজকে না ডেকে, নিজেই বেরিয়ে এলেন সেই গলার স্রষ্টার সাথে দেখা করতে। সামনে রাস্তার আলো আঁধারিতে দাঁড়িয়ে লম্বা ছিপছিপে একটা চেহারা। 'আরে আপনি!'

ডাক্তারের মুখ থেকে এই দুটো শব্দ আপনিই বেরিয়ে এল। সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক, আপাদমস্তক ঢাকা সাদা কাপড়ে। সাদা শান্তির প্রতীক আবার মৃত্যুরও প্রতিচ্ছবি। এই গ্রীষ্মের দাবদাহে ভদ্রলোকের সারা শরীর এক শুভ্র বসনে ঢাকা। অনেকটা আলখাল্লার মতো একটা বেশ।

কিন্তু সেই কাপড়ে একটুকরো ময়লা লেগে নেই—পুরো শ্বেতশুভ্র বসন। মুখটাও প্রায় সাদা কাপড়ের আড়ালে। শুধু চোখদুটো ধক ধক করে জ্বলছে। যেন অন্তরের সব প্রাণশক্তি এক নিমেষে শুষে নেবে। ভদ্রলোক চেম্বারে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে নেমে এল এক মৃত্যুর স্তব্ধতা। এক ইঞ্চি দরজার বাইরে রাস্তার কোলাহল, গাড়িঘোড়ার আওয়াজ আর কিছু শোনা গেল না। ঠিক কানে তালা লেগে গেলে যে অবস্থা হয় অনেকটা সেইরকম। বাইরের গ্রীষ্মের দাবদাহ আর অনুভব করা গেল না। কোথা থেকে ডাক্তারবাবুর শীত করতে লাগলো। ডাক্তারবাবু এটাও অনুভব করলেন, যে তিনি তার জায়গা থেকে এক পাও নড়তে পারছেন না।

ভদ্রলোক পরিচয় দিলেন, 'আমার নাম মনোহর মল্লিক'। ভদ্রলোক কথা বললেন ঠিকই। কিন্তু ওনার চোয়াল কিংবা মুখ, মনে হলো কিছুই নড়লো না। শব্দগুলো যেন ডাক্তারবাবু অন্তরে অনুভব করলেন। সে এক অদ্ভূত অনুভূতি।

'আপনি কে? আপনাকে তো আগে এইখানে দেখিনি!' ডাক্তারবাবু অতি কষ্টে আলাপ করার চেষ্টা করলেন সেই শুভ্র আগন্তুকের সাথে। 'সে কি! আমার নামে আপনার চেম্বার। আর আমাকেই চিনতে পারছেন না!' এল ব্যঙ্গ মিশ্রিত জবাব।

'আপনার এই চেম্বার হওয়ার আগে, এতদিন তো আমার নামেই জানা যেত এই দোকানঘরকে তাই না?'

'তবে কি, আপনি...' ডাক্তারবাবু আর কথা বলতে পারলেন না। 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। ওই নামেই আমি বেশি পরিচিত। উপেক্ষিত বলতে পারেন। আমার সহোদর ঈশ্বর তো দিনের পুজো নিয়ে নির্বাক শ্রোতা হয়ে বসে থাকেন। তাই আমাকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে মানবজাতির মনের খেয়াল রাখতে হয়। তৎসত্ত্বেও আমার পুজো কেউ করে না! যাক সে কথা, আপনার কাছে আমার একটি প্রস্তাব আছে। যদি অভয় দেন তো বলি। নাহলে যেভাবে এসেছিলাম, এক মুহূর্তে মিলিয়ে যাব। আর কোনোদিন আপনার কাছে আসব না। তাই জবাব খুব ভেবে দেবেন।'

ডাক্তারবাবু এখনো ঠাহর করতে পারছেন না, এটা সত্যি ঘটছে না স্বপ্ন।

'ভাবছেন এটা কি সত্যি, তাই না?' এল ব্যঙ্গমিশ্রিত উত্তর। শিউরে উঠলেন ডাক্তারবাবু। ভদ্রলোক তো অন্তর্যামী! এক মুহূর্তে ওই আলো-আঁধারি চেম্বার থেকে ছুট্টে বেরিয়ে যেতে চাইলেন। চিৎকার করে লোক জড়ো করতে চাইলেন। বলতে চাইলেন। তিনি শয়তানকে খুঁজে পেয়েছেন। এই মুহূর্তে ওনাকে ধরে যেন বন্দী করা হোক।

আবার সেই হাড়-মজ্জা কাঁপানো স্বর। 'আমার হাতে বেশি সময় নেই ডাক্তারবাবু। আপনাকে এই মুহূর্তে আপনার নিজের জীবনকে বেছে নিতে হবে। প্রথম পথ, যেরকম চলছে, সেই রকমই চলবে। সময়ের সাথে সাথে আরও প্রতিকূলতা বাড়বে। আপনার সব বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী-পরিবার এমন কি দ্রুজ-র কাছে হাস্যস্পদ আর করুণার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকবেন। আর দ্বিতীয় পথ সম্পূর্ণ অন্যরকম।

'সেটা কিরকম?' অনেক সাহস সঞ্চার করে ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন।

'বাঃ, কথা মনে ধরেছে দেখছি। অন্য পথ হচ্ছে অভ্রভেদী সাফল্য। আপনার নাম সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে। অর্থ, যশ, সম্মান, আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। আপনি যা হাত দেবেন তা সোনা হয়ে যাবে। কিন্তু এর একটা মূল্য ধরে দিতে হবে।'

ডাক্তারবাবু সংশয় ভরা প্রশ্ন, 'মূল্য?'

'হ্যাঁ, আপনার জীবন! এই জীবন আপনি আগামী কুড়ি বছর যাপন করতে পারবেন। তারপর আপনাকে আমি আমার জায়গাতে নিয়ে যাব।'

'মানে নরকে?' ডাক্তারবাবু শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ ওই নামেই তো আপনারা জানেন।' আবার সেই ব্যঙ্গের হাসি।

'ওটা কি খুব খারাপ জায়গা?' এল ডাক্তারবাবুর সংশয় ভরা প্রশ্ন।

'আচ্ছা পরের কুড়ি বছর যে রাজার হালে আপনি জীবন যাপন করবেন, সেটা কি বড় কথা নয়?' মনোহর মল্লিক হাসতে হাসতে কথাটা ছুড়ে দিলেন।

ডাক্তারবাবু বুঝলেন, ওনার হাতে সিদ্ধান্ত নেবার সময় বেশি নেই।

আর একটু সাহস সঞ্চার করে জিজ্ঞাসা করে ফেললেন, 'তাহলে, কিভাবে এগোনো যায়।'

'এই তো, এতক্ষণে ঠিক কথা বলছেন।' বললেন মনোহর মল্লিক। এবার হাসিতে ব্যঙ্গের রেশ কম।

'আমি, আমাদের মধ্যে যে শর্ত হলো, তার দলিল তৈরি করেই এনেছি। আপনাকে শুধু পড়ে সই করে দিতে হবে। আর স্বাক্ষর হতে হবে আপনার রক্ত দিয়ে।'

'সেটা কেন'? ডাক্তার শিউরিয়ে প্রশ্ন করলেন।

কারণ সেটাও এই শর্তের নিয়ম। ওইভাবে হলে, আপনাদের ঈশ্বরও এটি খেলাপ করার কথা সাহস করবেন না।' এই কথা বলে, মনোহর মল্লিক কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন।

অহরিমানবাবু কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলেন, এইরকম মসৃণ কাগজ তিনি জীবনে দেখেননি। আর তার ওপর সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে পুরো শর্ত লেখা আছে।

আজকের তারিখ, ৪ঠা জুন, ২০৪১—কুড়ি বছর এগিয়ে, মধ্যরাতের সময় দিয়ে পরিষ্কার লেখা আছে।

ঘরে একটিও আওয়াজ নেই। আবার সেই কানে তালা লাগা অনুভূতি। স্ক্যালপেল খুঁজতে অহরিমানবাবুকে ঘরে যেতে হলো না। মনোহরবাবু কোথা

থেকে ওটি নিয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাঁপা হাতে মনোহর মল্লিকের কাছ থেকে স্ক্যালপেল নিয়ে—একটু চেপে হাতের ওপর একটা ক্ষত সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন। অদ্ভুতভাবে, ক্ষত হলো ঠিকই, কিন্তু রক্ত বেরলো না। ডাক্তারবাবু খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন।

পাশ থেকে মনোহর মল্লিক চাপা কিন্তু ভয় ধরানো গলায় বললেন, এইরকম হয়ে থাকে। আমার ভাই ইশ্বর আপনাকে আর একবার ভেবে দেখার সুযোগ দিচ্ছেন যাতে আপনি সই না করেন।

'আমি আর পারছি না, আমি সই করতে রাজি।' চিৎকার করে উঠলেন ডাক্তারবাবু।

বলার সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত ধারায় রক্ত বেরিয়ে এল। সইও সম্পন্ন হলো।

'তাহলে আপনার সুসময় এখন থেকেই শুরু হোক, আর দেরি কেন?' মনোহর মল্লিকের গলায় সেই ব্যঙ্গের সুর।

ডাক্তারবাবু দেখলেন, তিনি একটা চেয়ারে বসে আছেন। ঘরটা প্রায় পুরোই অন্ধকার। তিনি আর চিন্তা করতে পারছেন না। এখন হাতটা যন্ত্রণা করছে। ঠিক এই সময় বাইরে প্রচণ্ড গণ্ডগোলের আওয়াজ শুনতে পেলেন। একটি অচেনা যুবক তার চেম্বারে হঠাৎ ঢুকে পড়ে, প্রায় পায়ে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। 'ডাক্তারবাবু আমাকে বাঁচান। আমার স্ত্রী প্রসব যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। হাসপাতাল বলছে অপেক্ষা করতে, কিন্তু আমার হাতে সময় এক্কেবারে নেই।'

ডাক্তারবাবু পাশে দেখলেন, মনোহর মল্লিক ওনাকে যেতে ইশারা করছেন। কোনোরকমে সেই ভদ্রমহিলাকে রিকশা করে চেম্বারে নিয়ে আসা হলো। ওনার শাশুড়িও অর্থাৎ যুবকের মা সঙ্গে এলেন। ডাক্তারবাবু ওই যুবককে বাইরে থাকতে বললেন। এবং মহিলার সেবা শুরু করলেন। কয়েক ঘণ্টা যমে-মানুষে টানাটানি চলল। কিন্তু অলৌকিকভাবে, মহিলাকে বাঁচানো গেল এবং তিনি দুটো ফুটফুটে যমজ সন্তান জন্ম দিলেন—একটি পুত্র আর একটি কন্যা সন্তান। বাচ্চাদের ঠাকুমা, যিনি নার্সের দায়িত্ব ডাক্তারের পাশে থেকে পালন করছিলেন, তিনি তো ডাক্তারের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

বাইরে বেরিয়ে যুবককে খবর দিতে এসে দেখেন বিপুল জনরাশির ভীড়। কোথা থেকে টেলিভিশনের রিপোর্টাররাও চলে এসেছেন। ডাক্তারবাবু ইতস্তত করে সুখবর সবাইকে দিলেন। লোকেরা ধন্য ধন্য করতে লাগল।

দাবানলের আগুনের মতো খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সব টেলিভিশন চ্যানেলে ডাক্তারবাবুর কথা বার বার বলা হতে লাগল। 'সমাজের সেবক, প্রকৃত মানব প্রেমী' এই ধরনের প্রচুর অলঙ্কার ভূষিত শব্দে অহরিমানবাবুর জয়গান হতে লাগল চারিদিকে।

পরদিন সকালে বারাসাতের কাউন্সিলর আর সরকারি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ নিজে দেখা করতে এলেন। সসম্মানে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ওখানে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া হলো কিভাবে একই স্টাফ দিয়ে বেশি রুগীর সেবা করা যায়। যাতে এইরকম অঘটন না ঘটে। বিকেলের মধ্যে এই খবরও রটে গেল। কাউন্সিলর বসু মশাই বললেন, 'উনি তো আমাদেরই লোক। আমাদের গর্ব।'

বছর ঘুরতে না ঘুরতে নানা হাসপাতাল, ক্লিনিক, দাতব্য ডিসপেন্সারি থেকে অহরিমানবাবুর ডাক আসতে লাগল। তারা এসে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতেন কিভাবে বেশি রুগীর শুশ্রূষা করা যায়। ডাক্তারি পেশা ব্যতীত সমাজের বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ ডাক্তারের সাথে দেখা করতে আসা শুরু করলেন।

সুনাম একবার হয়ে গেলে, রুগীর কথা আর ভাবতে হয় না। বছর ঘুরতে না ঘুরতে প্রতিদিন প্রায় একশো রুগী ডাক্তারের দরজায় এসে হাজির হতো। সব জায়গাতে রটে গেল ডাক্তার তো নয়, ধন্বন্তরী! রুগীকে দেখেই এমন ওষুধ দেন, যে রুগীকে আর দ্বিতীয়বার আসতে হয় না। সে যত কঠিন রোগই থাক না কেন।

সেই একই সময়ে, অহরিমান সেনের এই সুনাম নজরে পড়লো বড় ওষুধের কারখানা আর বেসরকারি হাসপাতালের মালিকদের। সেই সব ওষুধের কোম্পানির মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এসে ডাক্তারবাবুকে তাদের ওষুধের

গুণাগুণ সম্বন্ধে ভজাতে শুরু করে। এবং 'অনেক কিছু' দেবে বলে প্রস্তাবও করে। বড় হাসপাতালের মালিকেরা এসে ডাক্তারকে তোষামোদ শুরু করে, যদি উনি কয়েক ঘণ্টার জন্যে সেইখানে যেতে পারেন 'উপযুক্ত পারিশ্রমিকের' বিনিময়ে।

অহরিমানবাবু ভাবতে শুরু করলেন হয়ত সত্যি তার সুসময় ফিরে এসেছে। আর ওই মনোহর মল্লিক নিছক তার মনেরই কল্পনা। কিন্তু হাতের কাটা দাগ সেই কল্পনাকে প্রশ্রয় দিত না...

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী অনুভা দেবী খুব সম্ভ্রান্ত বাড়ির মেয়ে। অহরিমানবাবুকে তার খারাপ সময়ে অনেক মনের জোর দিয়েছিলেন। অহরিমানবাবু দেখতে লাগলেন, তার উন্নতির সাথে সাথে স্ত্রীরও স্বভাবে বহু পরিবর্তন হতে লাগল। এই দশ কাঠা বাগানের ওপর 'ছোটো' শ্বশুর মশায়ের বাড়িতে দম বন্ধ হতে লাগল তার। সেকেলে শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে থাকা হঠাৎই মুস্কিল হয়ে পড়লো। অহরিমানবাবুকে জোর করে আর একটা বড় জমি বায়না করতে বাধ্য করলেন। আর্কিটেক্টকে নিয়ে প্ল্যানও করতে শুরু করলেন, কিভাবে বাড়ির সাথে বড় ডাক্তারের চেম্বার হবে যেখানে ডাক্তারবাবু হিল্লি দিল্লি না ঘুরেই প্র্যাকটিস করতে পারবেন। আর ওই রাস্তার মোড়ের যে দোকান, সেটা হবে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ওষুধের দোকান।

ডাক্তারবাবু বুঝলেন, যে বড় রথ তার সম্মানের ভিত্তিতে তৈরি করার চেষ্টা চলছে, তা চালাতে গেলে প্রয়োজন প্রচুর অর্থ। এবং সে অর্থ রোজগার করতে হলে, তাকে আরও 'অনেক' কিছু করতে হবে।

কয়েক বছরের মধ্যেই রুগীর সংখ্যা অকল্পনীয়ভাবে বাড়তে লাগলো। তার সাথে হাসপাতালের ওষুধের কোম্পানির ভীড়। ডাক্তারবাবু দেখলেন, তার পক্ষে সবদিক বজায় রাখা সম্ভব হবে না। এই একই সময় অনীরবাবু জেদ ধরলেন, ওই বাস স্ট্যান্ডের চেম্বার যেটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার আর ওষুধের দোকান করে দেওয়া হয়েছে তার দায়িত্ব ওনাকে যেন দেওয়া হয়।

ডাক্তারবাবুর মনে খুব ইচ্ছা ছিল না। কারণ তিনি তার পিতাকে চিনতেন।

আজ পর্যন্ত উনি কোন কিছু বানাতে পারেননি শুধু খুইয়েছেন। কিন্তু অনীরবাবু ছাড়বার পাত্র নন। পুত্রের জয়যাত্রার রথে তারও ভাগ চাই। অবশেষে দ্রুজ পরামর্শ দিল, সেই বেশির ভাগ দেখাশুনো করবে। আর অনীরবাবু নামে মাত্র মালিক থাকবেন।

ডাক্তারবাবু রুগী দেখার কাজে যত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তার থেকেও পরিবার ব্যস্ত হয়ে পড়লো, কি করে আগামিদিনে তারা আরও অর্থ আর প্রতিপত্তি বাড়াতে পারে। অর্থ যেমন নতুন নতুন ধারায় সেনবাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল, তার থেকেও বাড়তে লাগল খরচ। দ্রুজ ব্যাপার বুঝে ডাক্তারবাবুর যোগ্য অ্যাসিস্ট্যান্টের ভার তুলে নিল। সব ওষুধ কোম্পানি এবং সব হাসপাতালের রেট নির্ধারণ করে দিল। ডাক্তারবাবু সেই ওষুধ প্রেসক্রিপশন করবেন যেই কোম্পানি ডাক্তারবাবুকে মোটা উপরি দেবে।

হাসপাতালের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। ডাক্তারবাবুর নাম প্যানেলে দেবার জন্যে এক রেট, যদি রুগী দেখেন তো আর এক রেট। সে একটি এলাহী রেট চার্ট তৈরি হয়ে গেল। ওষুধের কোম্পানি, বা হাসপাতালদের মাসের প্রথমেই টাকা দিয়ে দিতে হত। তার থেকে দ্রুজ নিজের ভাগটা সরিয়ে বাকি টাকা সেন পরিবারকে দিয়ে দিত।

এর মধ্যে মাঝে মাঝে কোনো দাতব্য হাসপাতাল বা অনাথালয় ডাক্তারবাবুর কাছে সাহায্যের জন্যে আসত। দ্রুজ খুব পটুতার সাথে ওষুধ কোম্পানির পুরনো ওষুধ তাদের পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করত। এতে ডাক্তারের নামও হত, আবার ডাক্তারের সময় ব্যয় করতে হত না।

এইভাবেই দিন, মাস, বছর হু হু করে ঘোড়ার জিনের ওপর ভর করে কেটে যেতে লাগল। উন্নতির চরম শিখরে অহরিমান সেন দেখলেন দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় প্রতিটি ঘণ্টাই তার বিক্রি হয়ে গেছে। তবুও পরিবারের চাহিদা বেড়েই চলেছে। বারাসাত এবং পুরো কলকাতাতে অনেকগুলো ক্লিনিক খোলা হয়েছে। সবগুলো অনীরবাবু দেখাশুনো করেন। ডাক্তারবাবুকে সামনে রেখে দুইতিন জন বড় কোম্পানি তার নামে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল

তৈরি করাও শুরু করেছে। অহরিমানবাবু এখন পশ্চিমবাংলার নতুন বিধান রায়। এইভাবে তাকে মিডিয়া সম্ভাষণ করতো। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, পরের ইলেকশনে উনি টিকিটও পেতে পারেন।

এদিকে, এত খাটাখাটনি করতে গিয়ে ডাক্তারবাবুর মধ্যবয়স্ক শরীরে অনেক রোগেরাও বাস করতে শুরু করেছে। কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার—এই তিন ভাই এক সাথেই ডাক্তারবাবুকে ভালো জব্দ করেছে। অনেকগুলো ওষুধ খেতে হয় তাদের দৌরাত্ম্য আয়ত্তে রাখার জন্যে। তাতে অবশ্য ডাক্তারবাবু পরিবারের থেকে কোনো সহানুভূতি পান না। তাদের মতে, ডাক্তারবাবুর দুঃসময়ে তারা সাথী ছিলেন, এখন ডাক্তারবাবুর পরিশোধের পালা। একমাত্র বন্ধু বলে সেই দ্রুজ দাস। সে-ই ডাক্তারবাবুকে বলে 'কর্তা আর কয়েক বছর কষ্ট করে নাও। তারপর তুমি পায়ের ওপর পা তুলে বাকি জীবন কাটাতে পারবে।' আসল কথা কেউই জানত না। তাই ডাক্তারবাবুও এই ব্যাপারে উচ্চবাচ্চ করতেন না।

এইভাবে বছরগুলো যেন কর্পূরের মতো শেষ হয়ে গেল। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে, ডাক্তার দেখলেন ৪ঠা জুন আর মাত্র এক সপ্তাহই বাকি। শিউরিয়ে উঠলেন ডাক্তার। হাতের কাটার দাগ মলিন হলেও এখনো স্পষ্ট। ঠিক যেন শয়তানের স্বাক্ষর—তার শরীরের সাথে লেগে আছে। স্ত্রী আর অনীরবাবু বাড়িতে কেউই নেই। কে জানে কি কাজে বেরিয়ে গেছে। এক গাদা চাকরবাকর ঘোরাঘুরি করছে। শরীরে ক্লান্তির রেশ। আনমনা ভাবতে ভাবতে চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাবেন, এই সময় দ্রুজ'র ফোন।

'ছোট কর্তা খুব মুশকিল হয়ে গেছে।' দ্রুজের গলায় ভয়ের রেশ।

ডাক্তারবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি হলো আবার?'

এই রকম ঘটনা আগেও কয়েকবার ঘটেছে। যেখানে বেশি পয়সা চাইতে গিয়ে কোনো হাসপাতাল বা ওষুধের কোম্পানি ডাক্তারবাবুর কাছে নালিশ করতে চেয়েছে। ডাক্তারবাবু তারপর মধ্যস্থতা করে ব্যাপারটা সামলে দিয়েছেন। কিন্তু এইবার দ্রুজর গলার আওয়াজে অশনি সংকেতের আভাস।

দ্রুজ জানাল বাঁকুড়াতে দেবালয় অনাথাশ্রমে যে ওষুধ পাঠানো হয়েছিল, সেই ওষুধ খেয়ে বাচ্ছারা চূড়ান্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অনাথালয় কর্তৃপক্ষ নাকি ডাক্তারবাবুকে বহুবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু দ্রুজ তা হতে দেয়নি। এখন তিনটি বাচ্ছা প্রায় মরণাপন্ন। ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালের ডাক্তারদের দাবি বহুদিন এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে যাওয়া ওষুধ খেয়ে নাকি এই অবস্থা। এবং এই ওষুধ যে বহু বছর অহরিমান সেনের ক্লিনিক থেকে আসত তা কারোরই অজানা ছিল না।

ফুলে মধু হলে, যেমন মৌমাছি ঠিক বুঝতে পেরে পৌঁছে যায়, ঠিক তেমনিভাবে একদল টেলিভিশন রিপোর্টার পৌঁছে গেল দেবালয়ে। আর একদল চলে এল সেই ডাক্তারবাবুর চাঁপাডালি মোড়ের ক্লিনিকে। পরের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আস্তে আস্তে পুরো ব্যাপারটার খোলসা হতে লাগল। এটা কারো জানতে বাকি রইল না, কিভাবে ডাক্তার ভালো মানুষের মুখোশ পরে বিশাল মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন। কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছেন, আর ওষুধের কোম্পানির থেকে পুরনো এক্সপায়ারি ডেট পার করা ওষুধই চালান করেছেন এইসব দুঃস্থ ক্লিনিকে।

মানুষের যেমন ছোঁয়াচে কোনো রোগ হলে বাকিরা তাকে এড়িয়ে চলে, সব রাজনৈতিক দল, হাসপাতাল ডাক্তারবাবুর থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিল। পরের দিন সন্ধ্যের খবরে এও জানা গেল যে ডাক্তারের নামে সিবিআই এনকোয়্যারি করা হোক তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছেন।

অহরিমানবাবু ভাবতেই পারছিলেন না এইসব এত তাড়াতাড়ি কি করে হচ্ছে। পরিবার তার পাশে থাকা তো দূরের কথা, তারাও ডাক্তারের ওপর ভয়ঙ্কর দুর্ব্যবহার করা শুরু করে দিল। রাতের অন্ধকারে ডাক্তারবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভিড় এড়িয়ে তার চাঁপাডালির মোড়ে ক্লিনিকে গিয়ে বসলেন। পাশের থানার বড়বাবুকে ফোন করে দেওয়াতে উনি দুজন পুলিশ ক্লিনিকের সামনে মোতায়েন করেছিলেন। ক্লিনিকের বাইরে পুলিশ দেখে, খবর ছড়িয়ে পড়ল। ডাক্তারবাবুর ওইখানে, আবার বিপুল জনরাশি কোথা থেকে হাজির

হয়ে গেল ক্লিনিকের সামনে।

ক্লিনিকে ঢুকে, ডাক্তার এক আশ্চর্য শান্তি অনুভব করলেন। বাইরের কোলাহল কানে আসছিল ঠিকই কিন্তু কেন জানি মন বলছিল সব ঠিকই হয়ে যাবে। আর ঠিক সেই সময় সেই পরিচিত গলা আবার শুনতে পেলেন 'আসতে পারি ডাক্তার?'

এইবার আর ডাক্তার ভয় পেলেন না। যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। দৌড়ে চেম্বারের দরজা খুলতে যাবেন, দেখেন সেই সাদা আগন্তুক দাঁড়িয়ে আছেন। পুরো একরকম চেহারা। এই কুড়ি বছরে ডাক্তারবাবুর দেহে কম করে কুড়ি কেজি মাংস লেগে গেছে, কিন্তু মনোহরবাবু ওরফে সাদা আগন্তুকের চেহারা এক্কেবারে এক আছে।

আবার সেই ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাড় কাঁপানো গলায় উক্তি, 'কেমন আছো ডাক্তার?'

'আপনি, মানে তুমি তো সবই জানো।' ডাক্তারবাবুর তাৎক্ষণিক উত্তর।

'আসলে সময়টা শেষ হয়ে আসছে তো, তাই এইসব হচ্ছে', এল মনোহরের উত্তর।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'তুমি তো আমাকে বলোনি।'

'তুমি কি জিজ্ঞেস করেছিলে, কিভাবে সময় শেষ হবে?' প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের জবাব দিলেন মনোহর।

'কিন্তু আমার হাতে তো এখনো এক সপ্তাহ সময় আছে।' ডাক্তারের প্রশ্ন।

'ঠিক, কারণ সিবিআই-এর কম করে এক সপ্তাহ লাগবে তোমার বিরুদ্ধে সব কাগজ আর দলিল যোগাড় করতে,' জবাব দিলেন মনোহর।

'তাহলে এই কদিন আমার এইরকম কাটবে।'

'সেইরকমই তো মনে হয়'। আবার সেই ব্যঙ্গের সুর।

'তার মানে ঘটনাটা এইদিকে গড়াবে তুমি জানতে?' ডাক্তারবাবু রেগে গিয়ে প্রশ্ন করলেন।

'তা বলতে পারো। আজ পর্যন্ত যারা এই দলিলে সই করেছে তাদের সবার

ঘটনাই এক দিকেই গেছে। এর কোনো তারতম্য আমি তো দেখিনি।' এল মনোহরের উত্তর।

'আর একটা কথা বলা দরকার ডাক্তার, 'এই যে গত কুড়ি বছরের ঘটনার মধ্যে দিয়ে তুমি গেলে, এটা গত কুড়ি মিনিট ধরে ঘটেছে।' আস্তে আস্তে মনোহর শব্দগুলো ছুড়ে দিলেন।

'তার মানে?' ডাক্তার চিৎকার করে প্রশ্ন করলেন।

'মানে যে ঘটনা তুমি মনে করলে কুড়ি বছর ধরে ঘটেছে, তোমার সইয়ের পরে আমি চটজলদি গত কুড়ি মিনিট ধরে তোমাকে দেখিয়ে দিলাম,' বললেন মনোহর।

'তার মানে এখনো আশা আছে, আমি নিজেকে পরিবর্তন করতে পারি।' ডাক্তারের গলায় আশার সুর।

'না ডাক্তার, তা হওয়ার নয়। তোমার সই হয়ে গেছে। দ্রুজ, অনীর আর অনুভা এরা আমারই লোক। এরা দেখবে তুমি ঠিক এইভাবেই আগামী কুড়ি বছর উন্নতি করে ধীরে ধীরে আমার কাছে যেন চলে আসো। এক কোলাহল দিয়ে তোমার জীবন শুরু হয়েছে, আর এক কোলাহল দিয়েই তোমার জীবনের অবসান হবে,' হাসতে হাসতে বললেন মনোহর।

ডাক্তার সেই চেয়ারে আবার বসে পড়লেন।

'মনোহর, আর কি কোনো উপায় নেই।' ডাক্তার কাতরভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

'আছে ডাক্তার। এখুনি যদি তুমি আমার সাথে চলো। তাহলে এই আগামী কুড়ি বছরের শর্তের সাফল্যের যন্ত্রণা থেকে এক্ষুণি মুক্তি পেয়ে যাবে। আর হয়তো বা নরকে তোমার একটা ভালো ঠাঁইও হয়ে যেতে পারে।' বলতে বলতে মনোহর আস্তে আস্তে এগিয়ে এল ডাক্তারের দিকে।

অহরিমান আর কিছু ভাবতে পারছিলেন না।

'তবে তাই হোক মনোহর, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো।'

ডাক্তারবাবু কথা শেষ করার আগেই তার চোখে আঁধার নেমে এল।

ধক ধক করে মনোহরের চোখদুটো জ্বলে উঠল।

'এই তো, এক্কেবারে ঠিক সিদ্ধান্ত।' মনোহরের উত্তর তারই অট্টহাসিতে মিলিয়ে গেল।

বাইরে ততক্ষণ শয়তানের কারখানা ব্যতীত বাকি দোকানের সন্ধ্যেবাতি জ্বলে গেছে। ❑

পুনশ্চ: এই গল্প কোনোভাবেই চিকিৎসক সমাজের কাউকে নিন্দে করে লেখা নয়। তাও কোনোভাবে কারো সাথে যদি মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। গল্পটি ষোলোশ শতাব্দীর বিখ্যাত নাট্যকার ক্রিস্টোফার মারলোর 'ডক্টর ফাওস্টাস'-এর নাটক অবলম্বনে লেখা। চরিত্রের নামগুলি বিভিন্ন সংস্কৃতিতে 'শয়তানের' প্রতিশব্দ তাই হয়তো একটু অন্যরকম লাগতে পারে।

চেকমেট

সেদিন ছিল বর্ধমান টাউনের হরিশচন্দ্র কলেজের গ্যালা ইভেন্ট। ইন্টার কলেজ দাবা প্রতিযোগিতার ফাইনাল। এবার উত্তেজনা তুঙ্গে। কারণ যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ফাইনাল খেলবে, তারা এই কলেজেরই ছাত্র। একজন জ্যোতিব্রত রায়। আর দ্বিতীয় জন মানব মিত্র। জ্যোতিব্রত অর্থনীতির ছাত্র, মানব ইংরেজির। মানব আগের সব রাউন্ডগুলো অত্যন্ত পটুতার সাথে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছে। অন্যদিকে জ্যোতিব্রতর ব্যাপারটা অন্যরকম। কয়েকটা রাউন্ড হারতে হারতে ড্র করে বা কোনো রাউন্ড প্রচণ্ড ভালো খেলে জ্যোতিব্রত ফাইনালে উঠেছে। জ্যোতিব্রত ওইরকমই খেলোয়াড়। তার খেলার মাধুর্য তার মনের ওপর বিরাজমান এবং স্টক মার্কেটের মতো কেবলই ওঠানামা করে।

গত দশ বছরের ইতিহাসে এই ঘটনাটা কোনোদিন ঘটেনি। প্রথম পুরস্কার যদিও হরিশচন্দ্র কলেজের ছেলেমেয়েরা বহুবার পেয়েছে কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার দুটোই কলেজে থাকবে, সেটাই টান টান উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

রাজ্যের দাবা দুনিয়াতে হরিশচন্দ্র কলেজের নাম আছে। এখান থেকে একজন গ্র্যান্ডমাস্টার এবং দুজন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার এর আগে তৈরি হয়েছে। এখানকার ট্রেনার রাজেন সান্যাল এবং তার দল বহুবছর ধরে এই প্রতিভা তৈরি করে চলেছেন।

মানব আর জ্যোতিব্রত সেই স্কুলেরই ছাত্র। আর তার থেকেও বড় কথা দুজনে একে অপরের খুব ভালো বন্ধু। আর সেটা গোপন কথা নয়। তাই উত্তেজনা আরও টানটান।

এবার ওদের দুজনের কথায় আসা যাক। ওদের আলাপ কলেজের গেম রুমে। মানব খুব মন দিয়ে দাবার বোর্ডে একটা পজিশন পর্যবেক্ষণ করছিল। কোথা থেকে হুট করে জ্যোতিব্রত এসে সামনে বসে প্রশ্ন করেছিল 'দাবা খেলো নাকি ভাবছো খেলবে।'

প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল মানবের। মানব উপযুক্ত জবাব দিল 'দেখা যাক, তবে এক হাত হোক।' সেদিন তারপর যতক্ষণ না কলেজ বন্ধ হয়েছিল তারা দাবা খেলেছিল। অনেকগুলো গেম ওরা সেদিন খেলেছিল। নর্মাল চেজ, স্পীড চেজ। অনেকে জোট হয়ে ওদের খেলা উপভোগ করেছিল। মানব ভালো খেলোয়াড়। বেশির ভাগ ম্যাচেই ও এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্যভাবে জ্যোতিব্রত তার অবস্থা সামলে, মানবকে আক্রমণ করেছিল। অনেক রাতে যখন দারোয়ান ওদের দুজনকে প্রায় ঘাড় ধরে বার করে দেওয়ার যোগাড়, ততক্ষণে খেলার বোর্ড ছাড়িয়ে ওদের বন্ধুত্বের বীজ বপন হয়ে গেছে।

তারপর আর দুজনকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কলেজের পর দাবার বোর্ড নিয়ে বসা। সেখান থেকে সাহিত্য, নাটক, রাজনীতি কি বিষয়ই না আড্ডা হতো। জ্যোতিব্রত প্রচণ্ড জোরে কথা বলত। দূর থেকে মনে হতো যেন ঝগড়া করছে। মানব ঠাণ্ডা ভাবে জবাব দিত। ওরা একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠল। মানব জ্যোতিব্রতকে রাজ সান্যালের কাছে নিয়ে এল। রাজ ওর খেলা দেখে বলল জ্যোতিব্রতর খেলাতে অভিনবত্ব আছে ঠিকই, কিন্তু পাকা খেলোয়াড়ের বিপক্ষে পড়লে, জ্যোতিব্রত মুখ থুবড়ে পড়বে।

অনেক বলে কয়ে রাজ সান্যালকে রাজি করানো হল, যাতে জ্যোতিব্রতকে পালিশ করে খেলাটায় উন্নতি করা যায়। তবে যখনই মনে হত অনেকটা পথ আসা হয়েছে, এমন একটা চাল দিত জ্যোতিব্রত, যে রাজ দূর দূর করে স্কুল থেকে বার করে দিত।

তাতে অবশ্য জ্যোতিব্রতর কোনো রাগ ছিল না। সে দাবা খেলত তার খেয়ালে। মানবের সাথে থাকতে তার ভালো লাগত। অর্থাৎ মানব যদি দাবা না খেলে ক্রিকেট খেলত, জ্যোতিব্রত হয়ত ক্রিকেট খেলাতে চলে যেত। সেই অপেশাদারি মনোভাব তার খেলাতে প্রকাশ পেত। আর সেই জন্যেই রাজ স্যার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন।

ফাইনালের আগের রাত। সারা কলেজে ওদের দুজনের বড় বড় ছবি এদিক ওদিক টাঙানো। মানব, জ্যোতিব্রতকে বলল, 'তুই কাল কী ওপেনিং করবি'। জ্যোতিব্রত তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'সাদা হলে কিং'স গ্যামবিট' আর কালো হলে 'গ্রানফেল্ড ডিফেন্স'।

মানব অত্যন্ত বিরক্ত হলো। ওই দুটো ওপেনিং জ্যোতিব্রত বলার কারণ ওগুলো খুব আক্রমণাত্মক। অনেকটা তলোয়ারের ওপর দিয়ে হাঁটা। ঠিক করে না খেললে এক্কেবারে নিশ্চিত পরাজয়। এর আগে যখন ওরা অনুশীলন করত ওই ওপেনিং নিয়ে, কোনো সময়ই জ্যোতিব্রত ঠিক করে খেলে উঠতে পারেনি। এদিক ওদিক করে, মিডল গেম, একটা দুটো ভালো চাল দিয়ে খেলা হয়ত বাঁচিয়ে দিত, কিন্তু কখনোই মানবের মনে হয়নি ওটা জ্যোতিব্রতর আয়ত্তে।

মানব ঠাণ্ডাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল 'তার থেকে সিসিলিয়ান বা কুইন'স গ্যামবিট বা রুইলোপেজ খেল। তোর তো ওতে ভালো দখল আছে।' কিন্তু জ্যোতিব্রতকে বলা আর ভস্মে ঘি ঢালা এক ব্যাপার। সবকিছুই তার কাছে ছেলেখেলা। তাই সে এক্কেবোরে মানতে রাজি হলো না যে সে কিং'স গ্যামবিট বা গ্রানফিল্ড কম জানে। মানব আর কথা বাড়ালো না। সেদিন একে অপরকে জেতার আশ্বাস দিয়ে যে যার বাড়িতে ফিরে গেল।

পরদিন বিকেল বেলা। কলেজে তিল ধারণের জায়গা নেই। সবাই কলেজের বিশাল হল ঘরে জমায়েত হয়েছে। কয়েকটা ক্যামেরা এমন করে রাখা হয়েছে যাতে ওদের খেলাগুলো চারিধারে মনিটরে টেলিকাস্ট করা যায়। রাজ সান্যাল এবং কলকাতা চেজ ফেডারেশনের সুব্রত বিশ্বাস দুজন রেফারি। মানব আর

জ্যোতিব্রত দুজন এসে নিজেদের জায়গাতে বসলো। রেফারি যখন ওদের খেলার নিয়ম বোঝাচ্ছে, জ্যোতিব্রত চারিদিকে ওদের খেলা টেলিকাস্ট হচ্ছে দেখে সে আনন্দে উদ্ভাসিত। সে মন দিয়ে শুনলোই না যে এটা এক রাউন্ডের খেলা। জেতা কিংবা হারা তাতেই নির্ধারণ করা হবে। কোনো অন্যায়, নিয়মের উল্লঙ্ঘন হওয়া মাত্রই সে খেলোয়াড়কে অযোগ্য মেনে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

জ্যোতিব্রত টসে জিতে সাদা নিয়ে যথারীতি কিং'স গ্যামবিট দিয়ে শুরু করল। প্রথম পনেরো দান দুজনেই ঝড়ের মতো খেলল। মানব মনে মনে খুশি হলো যে জ্যোতিব্রত হয়তো বাড়িতে গিয়ে কিছুটা পড়াশুনো করেছে। ষোল দানের মাথায়, হঠাৎ জ্যোতিব্রত নিয়মের ব্যতিক্রম, একটা পওনের চাল দিল। সারা হলে চাপা শব্দ শোনা গেল 'এই যাঃ'। জ্যোতিব্রত এই প্রথম একটু ভয় পেল। এর আগে এরকম সে অনেক চাল দিয়েছে কিন্তু এতগুলো চোখ তাদের বোর্ডের ওপর না থাকায়, তার কিছু যায় আসেনি। এই জীবনে প্রথমে হেরে যাওয়ার ভয়, তাকে ধাক্কা দিল।

মানব জ্যোতিব্রতর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর সেই নিয়মের ব্যতিক্রম একটি ঘোড়ার চাল চাললো। জ্যোতিব্রত ঠিক বুঝতে পারল না। সে ততক্ষণ খেলা বাঁচাবার দিকে মন দিল। এরপর খেলাটা বেশ ঢিমে হয়ে গেল। আরও দশবারো চাল চালতে দুজনেরই প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল। কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা গেল, জ্যোতিব্রতর পালাবার কোনো পথ নেই। তার রাজা চারদিক দিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

এরপরের ঘটনা যা ভাবা গেছিল তাই হলো। সাতচল্লিশ চালের মাথায় মানব তার রানীকে এগিয়ে নিয়ে এসে জ্যোতিব্রতর রাজার সামনে বসিয়ে বলল 'চেকমেট'। জ্যোতিব্রত মুখ তুলে আর তাকাতে পারল না। রেফারি দুজন মানবকে জয়ী ঘোষণা করার আগেই চারিদিক থেকে সবাই এসে মানবকে জড়িয়ে ধরল। জ্যোতিব্রত কোনোরকমে সেই ভীড় ঠেলে নিজেকে বার করে

আনল। এবং এক ছুটে কলেজের বাইরে চলে গেল। হারা যে এত বড় জ্বালা সে জীবনে কোনোদিন অনুভব করেনি।

প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময়, জ্যোতিব্রতকে পাওয়া গেল না। মানব নিজের এবং জ্যোতিব্রতর প্রাইজ গ্রহণ করল। খবর রটে গেল, বর্ধমান শহরে দাবার আকাশে নতুন প্রতিভা মানব মিত্র। এর সাথে এটাও চাউর হয়েছিল মানব কিভাবে আস্তে আস্তে জ্যোতিব্রতকে শ্বাসরুদ্ধ করে বোর্ডে শেষ করেছিল। সবাই জানত ওরা খুব ভালো বন্ধু। তাই এক বন্ধুর সামনে আর একজনের এইরকম নির্মম পরাজয়ের যে বিকৃত আনন্দ সেদিন দর্শক উপভোগ করেছিল সে খবর প্রথম খবরের থেকেও বেশি উপভোগ্য হয়েছিল। জ্যোতিব্রতর কানেও এই দুটি খবর আছড়ে পড়েছিল। বলা বাহুল্য, হেরে যাওয়ার জ্বালার থেকেও পরম বন্ধুর কাছে 'অপমানিত' হয়ে পরাজিত হওয়া সে একেবারেই ভালো মনে মেনে নিতে পারল না। সব রাগ গিয়ে পড়ল মানবের ওপর। ঠিক করল আর সে মানবের সাথে কোনো সম্পর্কই রাখবে না।

এরপর বহুবার মানব জ্যোতিব্রতর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল। জ্যোতিব্রত এক্কেবারে পাত্তা দেয়নি। কলেজে আসা সে বন্ধ করে দিয়েছিল। দাবা খেলা তো দূরে থাক, গেম রুমে তাকে আর কোনোদিন কেউ যেতে দেখেনি। যেহেতু কলেজের তৃতীয় বর্ষ, ক্লাস এমনিতেই কম। হুড়মুড় করে পরীক্ষার দিনও এসে পড়ল। অন্য সব ছাত্রছাত্রীর মতো মানব, জ্যোতিব্রত পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। রেজাল্ট বেরোবার আগেই, ঝোড়ো হাওয়ার মতো জ্যোতিব্রত বর্ধমান শহর ছেড়ে দিল্লি পাড়ি দিল উচ্চশিক্ষার জন্যে। জেতা-হারার ওই পর্ব যে কি ভীষণভাবে তাদের দুজনেরই জীবনকে প্রভাবিত করবে তাদের দুজনেরই জানা ছিল না। তাদের বন্ধুত্ব, সেই মহীরূহ বৃক্ষ, প্রাণসুধার অভাবে অকালে শুকিয়ে গেল। তার তিক্ততার সাক্ষী রয়ে গেল সেই দাবা প্রতিযোগিতা।

এরপর দীর্ঘ দশ বছর কেটে গেছে। মানব বর্ধমান শহরের গণ্ডী পেরিয়ে কলকাতা আলেখিন চেজ ক্লাব চলে এসেছে। দাবাকেই জীবনের মূল মন্ত্র

করে, সে এখন একজন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার। তিনচারটি পত্রিকা আর খবরের কাগজে তার সাপ্তাহিক দাবার কলাম বেরয়। যা বহু হাজার পাঠক পড়বার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকে। তার দুটো বড় দাবার স্কুলও হয়েছে। সেখানে অনেক ছেলেমেয়েকে সে দাবা খেলা শেখায়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সে প্রায়ই খেলতে যেত, কিন্তু এই রাজ্যে যাতে দাবার চর্চা বজায় থাকে, রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় সে প্রচুর ওয়ার্কশপ করে থাকে। মোদ্দা কথা তাকে সবাই একজন ভালো খেলোয়াড় এবং তার থেকেও একজন ভালো মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করে।

এবার আসা যাক জ্যোতিব্রতর কথায়। দিল্লিতে গিয়ে অর্থনীতিতে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে সে চাকরি নিয়ে এদিক ওদিক প্রচুর ঘুরে বেড়াল। কোন জায়গাতেই বেশিদিন কাজ করতে পারত না। দু-তিন বছর কাজ করেই আবার নতুন চাকরি। কি যে সে খুঁজে বেড়াত তার চাকরিতে সে নিজেও জানত না। তার কাজের দক্ষতা প্রশংসিত, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাকে একঘেয়েমি পেয়ে বসত। আবার সে 'নতুনের' উদ্দেশ্যে পাড়ি দিত অন্য চাকরিতে। চাকরির যোগ্যতা তার সুনামের সাথে সাথে এই বদনাম ছিল যে সে বেশিদিন কোথাও টেঁকার পাত্র নয়।

ভাগ্যক্রমে বিশ্ব ব্যাঙ্কে একজন সিনিয়র অর্থনীতিবিদ হিসেবে চাকরি পেয়ে গেল। চাকরিটা কন্ট্র্যাক্টচুয়াল। অর্থাৎ দুই পক্ষের একে অপরকে ভালো লাগলে তবেই চাকরি বজায় থাকবে। এই ব্যবস্থা জ্যোতিব্রতর বেশ ভালো লাগল। এক্কেবারে সাদামাটা চাকরি যা সে এতদিন করে এসেছে তার কোনদিনই মনঃপূত হয়নি। যেখানে ঝুঁকি নেই সেখানে আনন্দও কম। বরাবরই বেপরোয়া জীবনযাপন করার আকর্ষণ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। তাতে হয়ত সে শান্তি পায়নি কিন্তু সুখ পেয়েছে প্রচুর।

স্পেনের লিনারেস শহর। বিশ্বব্যাঙ্কের একটা বড় কনফারেন্স হচ্ছে। জ্যোতিব্রত এবং আরও অনেক অর্থনীতিবিদ এসেছে তাদের রিসার্চের কাজ পরিবেশন করতে। আর ঠিক সেই সময়ই লিনারেসে আয়োজিত হচ্ছে

আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতা। ভারত থেকে চারজন খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতাতে নির্বাচিত হয়েছে। তাদের নাম দীপ্তি লাল, সূর্য কৃষ্ণান, দীপ্তেন্দু জানা আর সাক্ষী শর্মা। তাদের মধ্যে দীপ্তি, সূর্য আর সাক্ষী তিনজনই মানব মিত্রর ছাত্র। তাই ভারত সরকার এইবার মানবকেই ভারতীয় দলের ম্যানেজারের গুরুদায়িত্ব দিয়ে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠিয়েছে।

এত বড় দায়িত্ব মানব এর আগে কোনোদিন নেয়নি। তাই যাতে সব সুস্থভাবে হয়, খেলোয়াড়রা তাদের প্রতিভা ঠিকভাবে প্রদর্শন করতে পারে সে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সব ব্যবস্থা করে এগোচ্ছে।

লিনারেস দাবা প্রতিযোগিতা আর বিশ্ব ব্যাঙ্কের কনফারেন্স প্রায় একসাথেই শুরু হল। জ্যোতিব্রত প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো গবেষণার কাজ প্রদর্শন করার দায়িত্বে ছিল, বা কোনো আলোচনাতে অংশগ্রহণ করতে হত। ওদিকে ভারতীয় দল বেশ ভালো প্রদর্শন করে আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে। এর আগেরবার ভারতীয় দলের প্রদর্শন খুব ভালো না হওয়াতে, প্রতিদিন মানবকে ভারত সরকারের ক্রীড়া দপ্তরে ফোন করে দলের সম্বন্ধে সব বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ দিতে হত। সেটাও আর একটা চাপের কারণ ছিল।

চারদিন ধরে লিনারেস দাবা প্রতিযোগিতা চলল। মানব মিত্রর টিম এবার খুব ভালো ফল করে সেমিফাইনাল অবধি পৌঁছতে পেরেছিল। এটি অভাবনীয় ব্যাপার। গতবার এই একই প্রতিযোগিতাতে ভারতের কোন খেলোয়াড় এক কিংবা দুই রাউন্ডের আগে যেতে পারেনি। তাই ভারত সরকার খুব খুশি। মানব মিত্রকে দেখবার জন্যে তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন বলে আশ্বাস দিলেন।

পঞ্চম দিন সব খেলোয়াড়দের শহর ঘুরিয়ে একেবারে এয়ারপোর্টে হাজির করা হল। ওদিকে জ্যোতিব্রতর কনফারেন্সও চার দিনে শেষ। কনফারেন্স চলাকালীন সে জানতে পেরেছিল লিনারেসে তখন আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতা চলছে। দাবা খেলার সাথে তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকলেও, দাবা খেলা সে কোনোদিন মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। দাবার ঘুঁটি আর

বোর্ড নিয়ে সে নাড়াচাড়া করত। যৌবনের ভালো লাগা স্মৃতি মন থেকে উপড়ে ফেলা যে একেবারেই অসম্ভব সেটা সে ভালোই অনুভব করেছিল।

মানবের উত্তরণ সম্বন্ধে সে কাগজে পড়েছিল, এবং মানবের লেখা পড়বার জন্য প্রতি সপ্তাহে আরও হাজার হাজার পাঠকের মতো উদগ্রীবভাবে অপেক্ষা করত। বহুবার মনে এই সুপ্ত বাসনা জেগেছিল যে মানব আর তার মধ্যের যে ভাঙা সেতু আজ দশ বছর বিরাজমান সে গিয়ে জোড়া দিয়ে দেয়, কিন্তু সেই নির্মম রাতের হারবার গ্লানি থেকে নিজেকে সে মুক্ত করতে পারেনি। লোকমুখের সেই কথা, যে আস্তে আস্তে মানব তাকে কিভাবে শ্বাসরুদ্ধ করে হারিয়েছিল, সে অপমান তাকে আজও ভীষণ কষ্ট দেয়।

হোটেল থেকে লেট চেক আউট করে জ্যোতিব্রত লিনারেস এয়ারপোর্ট পৌঁছল। এখান থেকে সোজা দিল্লির ফ্লাইট। এয়ারপোর্ট বেশ সরগরম। সকাল থেকেই সব ফ্লাইট, খেলোয়াড়দের তাদের নিজেদের দেশে পৌঁছে দিচ্ছে। ভারতে যাওয়ার প্লেন বেলা চারটে নাগাদ ছাড়ার কথা। কিন্তু কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ থাকায় তিন ঘণ্টা লেট!

অনিশ্চয়তায় ভরা এই পৃথিবীতে এটাই স্বাভাবিক জ্যোতিব্রত জানত। সে যেহেতু কাজের সুবাদে অনেক ঘোরাঘুরি করত, এইরকম অবস্থার জন্যে মনে মনে সে প্রস্তুত থাকত। সবসময়ই একটা-দুটো বই কি রিসার্চের পেপার তার ব্যাগে থাকায়, সে এই সময়টা নষ্ট হতে দিত না। অবশ্য যদি না নিদ্রাদেবী তাকে বশ করে ফেলত। আজ চারিদিকে এত দাবার খেলোয়াড়দের দেখে তার আর বই বার করা হলো না। এদিক ওদিক তার চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল যদি কোনো ভারতীয় খেলোয়াড়ের সাথে দেখা হয়।

'কি রে, কেমন আছিস?' হঠাৎ দশ বছরের ওপার থেকে সেই পরিচিত স্বর। জ্যোতিব্রতর ভেতরটা একটু কেঁপে গেল। পিছনে ফিরে দেখলো সেই মানব মিত্র। সেইরকমই রোগা ছিপছিপে চেহারা। সময়ের প্রলেপ একটা মোটা গোঁফের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। জ্যোতিব্রত কিছু বলার আগেই, মানব বলল, 'চল একটু চা আর টোস্ট খেয়েনি। কখন প্লেন ছাড়বে তো ঠিক নেই।'

জ্যোতিব্রত একটা কথাও বলতে পারল না। যন্ত্রের মতো মানবের সাথে হাঁটতে লাগল।

চা আর গরম টোস্ট নিয়ে দুজনে একটা নির্জন কোণে গিয়ে বসল। নিস্তব্ধতা পাশে রেখে, মানব নিজের নানা কথা বলা শুরু করল। জ্যোতিব্রত আস্তে আস্তে টোস্ট আর চা খেতে লাগল। হঠাৎ মানব বলল, 'আরে তোকে তো জিজ্ঞেসই করলাম না, তুই এখানে?' জ্যোতিব্রত সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে আবার নীরবতার আশ্রয় নিল। সে তখন তার দশ বছরের রাগ, অভিমানটা প্রাণপনে খোঁজার চেষ্টা করেও পারছিল না।

টোস্ট খাওয়া শেষ হলো। এই প্রথম জ্যোতিব্রত মুখ খুলল। 'আমি তোর কলম প্রতি সপ্তাহেই পড়ি। দারুণ লাগে।' মানব শুনে বলল, 'যাক, তোর যে ভালো লেগেছে, এই কথা শুনেই আমার আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। নাহলে কি যে লিখি সব সময়ই একটা আশঙ্কা থাকে।' এই সুযোগে মানব, আর একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিল জ্যোতিব্রতকে। 'তার মানে তুই এখনও দাবার চর্চা রেখেছিস?' একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল জ্যোতিব্রত। 'ওই আর কি' একটা জড়ানো উত্তর দিল সে।

অস্বস্তি মানবই কাটিয়ে দিয়ে বলল, 'এখনও তো প্লেনের ঢের দেরি। এক হাত হবে নাকি?' জ্যোতিব্রতর মুখ দিয়ে কেন জানি না 'হ্যাঁ' বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দুজনে সেই গেম রুমের মতোই হুমড়ি খেয়ে বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ল। মানব হাসতে হাসতে বলল, 'এবার কিন্তু আমি সাদা'। জ্যোতিব্রতর কথাটা ভালো লাগল না। কারণ সে বুঝল মানব মনে রেখেছে যে প্রতিযোগিতাতে সে কালো নিয়েই তাকে হারিয়েছিল।

আশ্চর্যভাবেই, মানব কিং'স গ্যামবিট দিয়ে খেলা শুরু করল। যতদূর জ্যোতিব্রতর মনে পড়ে, মানব কোনোকালেই হুড়মুড় করে আক্রমণাত্মক খেলা খেলতে পছন্দ করত না। তার এই পরিবর্তনে জ্যোতিব্রত বেশ মজা পেল। প্রথম পনেরো দান দুজনেই ঝড়ের গতিতে খেলল। তারপর মানব হঠাৎ একটা পাওনের চাল দিল যেটা কোন বইয়েই নেই। জ্যোতিব্রত বিশ্বাস করতে পারল

না, মানব কেন এই চাল চাললো। তার হিসেবে এটা মস্ত বড় ভুল। কারণ এই চাল থেকে আগামী পাঁচ চালের মধ্যে মানবকে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে পড়তে হবে। এক মুহূর্তে জ্যোতিব্রত ভাবল, এটা কোন মানবের ফাঁদ নয় তো, যা সে দেখতে পাচ্ছে না।

কিন্তু জ্যোতিব্রত বেশিক্ষণ ওটা নিয়ে চিন্তা করতে পারল না। সে তার সাবলীল খেলাতে ফিরে এল। যা ভাবা গিয়েছিল, তাই হল। পরের চার চালের মধ্যেই মানব বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়ল। এবং তার সাত চালের পরেই নৌকা আর ঘোড়ার জোরে মানবের রাজা চেকমেট।

জ্যোতিব্রতর প্রচণ্ড আনন্দ হল। মানব মিত্র, দেশের এখন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টারকে সে আজ লিনারেস এয়ারপোর্টে হারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পরমূহুর্তে মনে হলো মানব ইচ্ছা করে তার কাছে হারলো না তো, যাতে বন্ধুত্ব আবার জোড়া লেগে যায়। আশঙ্কা আর আনন্দ মিশ্রিত দৃষ্টি নিয়ে সে মানবের দিকে তাকালো।

মানব কোন উত্তেজনা না দেখিয়ে অল্প হেসে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করেছে। 'তুই এক্কেবারে ঠিক খেলেছিস, শাবাস'। এটা সাতাশ চালেরই খেলা।' জ্যোতিব্রতর বুঝতে বাকি রইল না, মানব ইচ্ছা করেই হেরেছে। সে তক্ষুনি রাগে ওইখান থেকে উঠতে যেতে চাইল।

মানব কথা বলতে লাগল। 'মনে করে দেখ জ্যোতিব্রত, আজ থেকে দশ বছর আগে তুই তোর ষোলতম চাল এই দিয়েছিলি। তারপর আমি এই চাল দিয়েছিলাম এবং এক মুহূর্তে জ্যোতিব্রতকে দশ বছর পিছিয়ে নিয়ে গেল। পরের আধ ঘণ্টা মানব আস্তে আস্তে জ্যোতিব্রতকে অতি যত্নসহকারে বুঝিয়ে দিল, যে তার সেই ভুল চালের ফলস্বরূপ, মানব কিভাবে সে খেলাটাকে অন্য চাল দিয়ে জিইয়ে রেখেছিল। যাতে জ্যোতিব্রত আবার খেলাটা তার নিজের বাগে আনতে পারে। মানব দেখিয়ে দিল, কিভাবে জ্যোতিব্রত সেদিন তিন থেকে চার খানা খুব বড় ভুল চাল দিয়েছিল। যার ফলস্বরূপ তার হারা ছাড়া আর কোনোই উপায় ছিল না।

এয়ারপোর্টের অ্যানাউন্সমেন্ট, হৈ হট্টগোল, জ্যোতিব্রতর কোনো কথাই আর খেয়াল ছিল না। তার নিজের ওপর ভয়ানক আক্ষেপ হচ্ছিল। এই দশটা বছর মিথ্যে অভিমান করে, সে মানবের মত পরম শুভাকাঙ্খীর বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নিজেকে বারবার ধিক্কার দিচ্ছিল সে।

অনুশোচনায় তার কথা জড়িয়ে গেছিল। কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। মানব বুঝতে পেরে বলল, 'অনেক মাথার কাজ তো হল, এবার একটু পা চালিয়ে ওগুলোরও এক্সারসাইজ করে নিই, কি বল?' শশব্যস্ত হয়ে জ্যোতিব্রত দাঁড়িয়ে পড়ল।

দূর থেকে দীপ্তি লাল ওদের দুজনের খেলা মন দিয়ে দেখছিল। সে আর থাকতে না পেরে কাছে এসে মানবকে অভিমানের স্বরে বলল, 'স্যার আপনি ষোলো চালে ওই পাওনটা যদি না এগোতেন এই সাতাশ দানে কোনোভাবেই আপনি চেকমেট হতেন না।'

'এক্কেবারে ঠিক কথা বলেছো,' বলে জ্যোতিব্রত হা হা করে হেসে উঠল। মানব জ্যোতিব্রতকে ওইভাবে দশ বছর পরে লাগাম ছাড়া ভাবে হাসতে দেখে সেও হাসিতে গলা মেলাল।

ঠিক সেই সময়ই, ভারতের কৃতি খেলোয়াড়দের সসম্মানে ভারতের মাটিতে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিমান কর্তৃপক্ষ এয়ারপোর্টের মাইকের মাধ্যমে তাদের আহ্বান জানাল। ❑

পুনশ্চ: লিনারেস বিখ্যাত দাবা প্রতিযোগিতা ২০১০-এর পর বন্ধ হয়ে যায়। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের আমার জানা কোনো কনফারেন্স লিনারেস শহরে হয়নি। আমার গল্পের তাগিদে আমি এই দুই ঘটনা এক জায়গাতে উপস্থাপন করেছি।

এলোমেলো

সব ভাবনা

শ ঙ্খ চি ল

জীবনের পাকদণ্ডী পেরিয়ে অনেক পথ
এখন এসেছি রাজপথের পাশে
ধুলো কালি মেখে শরীরের রং কালো
ছোট ছেলেমেয়ে আমায় দেখে হাসে।

হাসছি আমিও আমার কথা ভেবে
ভাবি দিন কি এইভাবেই কেটে যাবে
প্রতিক্ষার প্রদীপে তেল আসছে কমে
সময় বলছে এবার যাও থেমে।

কাজ এখনো কিছুই হয়নি করা
সারাদিন শুধু নিজেকে দিয়েছি তাড়া
উঁচু নিচু পথ মাঠ খাল বিল
মাথার উপর ছিল শঙ্খচিল।

প্রতি পদক্ষেপেই ছিল সে আমার সাথে
কথাও বলেছি তার সাথে দিনে রাতে
এইবার কাজ করতে হবে শুরু
সংশয় মন করছে দুরু দুরু।

রাজপথ ছেড়ে নেমে যেতে হবে মাঠে
ফিরতে হবে প্রথম নদীর ঘাটে
আবার হবে নতুন পথে চলা
শঙ্খচিলের সাথে মেলাব আমার গলা।

সি স্বা - ব্রু নো

ভোরের আলো ফোটার সাথেই
কাজে নেমে পরা
হাল্কা কিছু ব্রেকফাস্ট
করেই জগিং করা।

রাস্তাতে বন্ধুদের
রোজ খোঁজ নেয়া
অনেক কথা বলা হলে
দৌড়ে বাড়ি যাওয়া।

ঘরে ফিরেই
দিদিদের ঘুম থেকে তোলা
এ এক মস্ত কাজ
সহজে যাবে না বলা।

তারপর অনেক খেলা
বাবা মায়ের সাথে
দিদিরাও দাঁত মেজে
যোগ দেয় তাতে।

ব্রাঞ্চটা তাড়াতাড়ি
আমরা সেরে ফেলি
এত কসরতের পর
পেট যে তখন খালি।

এরপর দিদিরা
করে লেখালেখি
দুই ভাই দি পাহারা
যাতে না দেয় ওরা ফাঁকি।

বিকেল বেলা সবার সাথে
বিস্কুট খাওয়া
এরপর ঠিক সাতটায়
ডিনার খেতে যাওয়া।

সন্ধ্যের পর ক্লান্ত হয়ে
আমরা যে নি রেস্ট
মায়ের কোলেই ঘুমিয়ে পরা
সেইটাই লাগে বেস্ট।

এইভাবেই আমাদের
প্রতিদিন কেটে যায়
আমরাও ব্যস্ত খুব
তোমরা শুধু নয়।

বে ড়া তে যা ও য়া

সুটকেসে জামাকাপড়
হচ্ছে ঠাসাঠাসি
হালকা হাসি খুশির মেজাজ
আনন্দেতে ভাসি।

আঠারোটা জায়গা দেখতে হবে
সাকুল্যে সাত দিনে
ভাবতেই মধ্যবিত্তের
শরীর যাচ্ছে ঘেমে।

হলুদ কালো ট্যাক্সি এলো
যেন কোনো কনকলতার সংসার
কুড়ি টাকা বেশি দেবেন
ট্যাক্সিওয়ালার আব্দার।

হেলে দুলে ট্যাক্সি পেরোলো
বটতলার মোড়
বড় রাস্তা পড়তেই
গতি হলো জোর।

দূর থেকে হাওড়া ব্রিজ
যেন দিচ্ছে হাতছানি
সবই এলো ফেলে এলাম
আমার ঘরের আমি।

একলা ঘরে কবিতার খাতায়
করছে লেখালেখি
এই কদিনের ছুটিতে
সে আমায় দিলো ফাঁকি।

শ পি ং ম ল

সকাল বেলা সাজাও আমায়
অনেক যত্ন করে
রাতের বেলা আলোয় ভাসি
তোমার হাতটি ধরে।

এখানে তুমি খুঁজে বেড়াও
জীবনের নানান অনুভূতি
পুরনো নতুন প্রেমের আবেগ
মিষ্টি খুনসুটি।

চোখের তারায় জ্বালিয়ে দি
নানা স্বপ্নের ধোঁয়া
কোনো কিছুই কঠিন নয়
হাত দিয়ে যায় ছোঁওয়া।

আলাদিনের জিন আমি
প্রদীপ তোমার পকেট
যা চাইবে পেয়ে যাবে
আছে সব সাইজের প্যাকেট।

এইভাবে চলছে
মহাকালের চাকা
কফি হাউসের হলটা তাই
এক্কেবারে ফাঁকা।

মা য়ে র হা সি

ভালো লাগে বাবার
হাত ধরে ছুটতে
ভালো লাগে মেঘের সাথে
এরোপ্লেনে উড়তে।

ভালো লাগে ঠাকুরদার
নতুন গাড়ি চড়া
ভালো লাগে ঠাকুরমার
সাথে দুষ্টুমি করা।

ভালো লাগে পিৎজা আর
বাংলা মাছের ঝোল
ভালো লাগে ফুটবল যখন
মেসি দেয় গোল।

ভালো লাগে কার্টুন
রং পেন্সিল খেলা
ভালো লাগে সন্ধ্যেবেলার
টিমটিমে তারা।

এই সব আমিই
খুব যে ভালোবাসি
কিন্তু সবচেয়ে ভালো
আমার মায়ের হাসি।

চলে গেছে সে আমায়
ছেড়ে বহু দূরে
ছড়িয়ে রেখে তারই রেশ
সারা আকাশ জুড়ে।

দু গ্গা পু জো

দুগ্গা মা এলেন ঘরে
আবার হুলুস্থুল
ঢাকের শব্দ, শঙ্খধ্বনি
চণ্ডীপাঠ আর উলু।

সকালে শরীর ঘষে মেজে
জড়িয়ে নতুন সাজ
প্রথমবারেই অঞ্জলি
মস্ত বড় কাজ।

রোজ নামচা জীবন থেকে
একটু দিয়ে ফাঁকি
বেমালুমের আড্ডা জুড়ে
মন ভরিয়ে রাখি।

শহরের নতুন ধাঁচে
এই আমাদের পুজো
নীল আকাশ দেখি না আর
শরৎ মেঘের তুলো।

শিউলি ফুলের গন্ধ
আর পড়ে না মনে
হারিয়ে গেছে বোধহয়
কোনো কাশফুলেরই বনে।

সেলফি অনেক তোলা হলো
নানা রঙের ছবি
কোথাও যেন হারিয়ে গেছে
সেই শরতের কবি।

মা প

এই জীবনে শিখে নাও
মাপ করে চলা
মাপা শ্বাস মাপা হাসি
মেপে কথা বলা।

মাপা ফ্ল্যাট মাপা মাঠ
মাপা ঘর বাড়ি
মাপা বোনা ঝাউ গাছ
মাপা ফুলের হাঁড়ি।

সকালের জগিং
করো তুমি মেপে
বেশি চাপ নিলে আবার
হৃদয় যাবে ক্ষেপে।

মেপে খেও ক্যালরি
ডাল ভাত রুটি
মিষ্টি জীবন থেকে
করে দিও ছুটি।

মেপে নিও ভালোবাসা
ছড়িয়ে দেয়ার আগে
ভুল মাপে দিলে
অনেক ব্যথা পাবে।

এই মাপেই হোক
তোমার জীবন চলা
বেঁচে আছো কিনা
নাই বা হল বলা।

সান্তা জেঠুকে চিঠি

সান্তা জেঠু তোমার আবার
আসার সময় হলো
এবার আমার লিস্টটা বড়
মন দিয়ে তাই পড়ো।

এক, লুসির সাতটা বেবি
যেন ভাল থাকে
দুই, কম যেন বকে মা
প্লিস বলে দিও তাকে
তিন, আকাশের ধুলো ঝেড়ে
দিও নীল রং
চার, নুইয়ে পড়া গাছগুলো
করে দিও স্ট্রং
পাঁচ, ফোন রেখে মা বাবা
যেন কথা বলে

ছয়, দাদু আর দিদু যেন
থেকে যায় এই ঘরে
সাত, বারান্দার গাঁদা ফুল
যেন অনেক ফোটে
আট, ঠোঁট যেন না ফাটে
এই শীতেরই চোটে
নয়, রোজ বিকেলে পার্কে
যেন খেলতে পারি
দশ, কাশি আর জ্বরের সাথে
প্লিজ করে দিও আড়ি।

এইবারের মতো
দিলাম তোমায় ছুটি
আর কিছু নেই চাওয়ার
এবার করবো হুটোপুটি।

ন তু ন পৃ থি বী

শুকনো ফুল আর শুকনো পাতা
রাস্তা জড়িয়ে আছে
নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা
অনেক ছড়িয়ে আছে।

উপচে পড়া গাছের ফুলে
সবুজ পাতা দিচ্ছে উঁকি
নানা রঙের অনেক পাখি
খেলছে টুকি টুকি।

বাতাসের মিষ্টি পরশ
সতেজ করে মন
চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে
প্রকৃতির এই স্পন্দন।

বলছে তোমায়, দেখো আমরা সবাই
কেমন করছি হুটোপুটি
অনেকদিনই তোমরা থাকবে ঘরে
এইবার আমাদের দাও ছুটি।

দা দু - দি দু ভা ই য়ে র ক থো প ক থ ন

দিদুভাই :
দাদু আজ তুমি আমায়
একটা কথা বলো
দিম্মা বলে তুমি নাকি
জন্মে থেকেই বুড়ো।

সবাই যখন সন্ধ্যেবেলায়
করছে মাতামাতি
তুমি তখন আপন মনে
দিচ্ছ যে সাঁঝবাতি।

নতুন দেশ দেখতে তোমার
গায়ে যে আসে জ্বর
তোমার নাকি সবচেয়ে প্রিয়
তোমার পড়ার ঘর।

জিনিসপত্র কোনোকিছুই
নেই যে তোমার মন
একই সিনেমা দেখো বারেবার
শোনো না কোনো বারণ।

দিম্মা বলে খুবই মুশকিল
তোমায় নিয়ে চলা
মাও দেখি দিম্মার সাথে
মেলায় যে তার গলা।

দাদু :
ঠিক বলেছ দিদুভাই
আমি জন্ম থেকেই বুড়ো
নিজেই ভাবি এমনটি
কেমন করে হলো।

ছোট্টবেলায় বাবার হাত
ধরতে গিয়ে দেখা
জীবনের রাস্তায় আমি
দাঁড়িয়ে আছি একা।

সেদিন হঠাৎ কেমন
হয়ে গেলাম বড়
বাকি জীবনের যুদ্ধগুলো
করে দিলো বুড়ো।

পুরনো বই, পুরনো ছবি
তাই বারে বারে দেখি
খুঁজি ছোটবেলার দিন
যা দিয়েছিল ফাঁকি।

তুমিই আমার আনন্দের
এখন চাবিকাঠি
মাতাও আমায় তোমার তালে
করে তোমার খেলা সাথী।

রা জ বে শ

জন্মের প্রথম সকাল থেকেই
পরছি আমি হরেক রকম সাজ
ঠিক বেশটি খুঁজে যে না পাই
বয়েসের সাথে বেড়েই গেছে কাজ।

স্কুলের দিনে ভাল ছাত্রের বেশ
খুঁজতে গিয়ে শুধুই বেড়েছে ক্লেশ
কর্ম জীবনে একই হয়েছে হাল
যতই উঠেছি উন্নতির সে দেয়াল।

সংসারেও রয়েছে তার রেশ
সেখানেও পাইনি খুঁজে বেশ
এদিক ওদিক কাপড়ের টুকরো টেনে
কোনোরকমে দিন গিয়েছি গুণে।

আজ তাই অনেক ক্লান্তি নিয়ে
এসেছি আমি তোমার দ্বারে একা
পরতে সেই রাজবেশ
তোমার কাছে যা যত্নে আছে রাখা।

যদি ভালো লাগে
আবার হবে দেখা
আর তাই যদি না হয়
এইটুকু থাক লেখা।